জিজ্ঞাসা

জিজ্ঞাসা

তরুণ রায়

ব
লা
কা

RR
৮৯১.৪৪৩০১
তরুণ/৭৫

১ম সংস্করণ
১৫ই আগষ্ট, ১৯৫০
প্রকাশক
শ্রীভূদেব শংকর
'বলাকা'
৩১এ, চক্রবেড়িয়া রোড সাউথ
কলিকাতা — ২৫
প্রচ্ছদপট
নেপাল মুখোপাধ্যায়
মুদ্রাকর
স্থকুমার দত্ত
মহাজাতি আর্ট
১৩৬বি, আশুতোষ মুখার্জি রোড
প্রবোধচন্দ্র বসু
'আমাদের প্রেস'
৮বি, অক্রুর দত্ত লেন
বাঁধাই
দত্ত বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১০১, বৈঠকখানা রোড
পুস্তক-পরিবেশক
ভবানীপুর বুক ব্যুরো
১বি, রসা রোড

STATE CENTRAL LIBRARY
ACCESSION NO. ৫১-১৩৩৭১
২৬.২.০৭

দাম আড়াই টাকা

"......লেখক শ্রীতরুণ রায় উদ্বাস্তু নরনারীর মর্ম্ম কথা চিত্তাকর্ষক ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। রচনাভঙ্গী সাবলীল এবং সরল। হত-ভাগ্য উদ্বাস্তু গণের অসহায়তা ও চরম দুর্ভোগের যে বর্ণনা গল্প গুলিতে দেওয়া হইয়াছে তাহা যদি জাতিকে এই সমস্যা সমাধানে সক্রিয় করিয়া তুলিতে পারে, তবে লেখকের চেষ্টা সার্থক হইবে। পুস্তক বিক্রয়লব্ধ অর্থ উদ্বাস্তু গণের সাহায্যের জন্য দান করিবেন, লেখকের এই সাধু উদ্দেশ্যের জন্য তিনি ধন্য-বাদার্হ। গল্পগুলির বহুল প্রচার কামনা করি।......"

শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১৫-৭-৫০

ধন্যবাদ জানাই তাঁদের, যাঁরা আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন পাকিস্থানে জাহাজ করে হাজার হাজার উদ্বাস্তুদের নিয়ে আসার জন্যে। ধন্যবাদ জানাই লেখককে কারন আমার অনুরোধে এই সমস্যা মূলক চিত্রটী জাহাজে বসে লিখে, আমাকে দিয়েছেন সর্বসত্ব সমেত উদ্বাস্তু ভাণ্ডারে সাহায্য করার জন্যে। ধন্যবাদ জানাই, 'যুগান্তরের' পক্ষ্যে শ্রীসুকোমল কান্তি ঘোষকে যাঁর উৎসাহে লেখাটী পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ হয়। ধন্যবাদ জানাই বার্ত্তা সম্পাদক শ্রীদক্ষিনারঞ্জন বসুকে যিনি উপদেশ ও সর্ব-প্রকার সাহায্যে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেছেন। আর ধন্যবাদ জানাই সেই সব অনু-প্রাণিত পাঠকদের যাঁরা চিঠি লিখে বই প্রকাশে আমাকে প্রেরণা দিয়েছেন এবং শ্রীপ্রভাস চৌধুরীকে যিনি সম্পাদনার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

শ্রীভূদেব শঙ্কর

—বিশুর মত যারা হতভাগ্য,
সলিলের মত আত্মত্যাগী,
পণ্ডিতমশাইএর মত নির্ভীক,
বাসনাদির মত নারী,
হাবিলদারের মত সত্যদর্শী,
অনিলার মত স্বচ্ছ,
ডাক্তারের মত সেবক,
রাণীর মত প্রেরণার প্রতীক—

তাদের জীবনের চিরন্তন জিজ্ঞাসা
আমার পাঠক পাঠিকাদের সামনে
তুলে ধরছি।

স্বাধীনতা দিবস
১৯৫০

লেখক

এই বইএর প্রায় **প্রত্যেকটী ঘটনা সত্য।** লেখক **প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা** থেকে এগুলি সংকলন করেছেন। সেকারন প্রকৃত নামগুলি গোপন করতে হয়েছে। যদি অনিচ্ছাকৃত ভাবে কারুর সাথে নামের বা চরিত্রের সাদৃশ্য থাকে তবে তিনি যেন তা নিজগুণে মার্জনা করেন।

প্রকাশক

শুধু জল আর জল। যেন নিস্তরঙ্গ সমুদ্র। অনেক দূরে গিয়ে আকাশ আর জল মিশে গেছে। মেঘনা আর পদ্মা পাশাপাশি বয়ে চলেছে।

চাঁদপুর ষ্টীমার ঘাটে জড় হয়েছে—উদ্বাস্তুর দল—লক্ষ্মীছাড়া ছিন্নমূল জীবন। পরনের কাপড় টাঙ্গিয়ে তাঁবু বানিয়ে পড়ে আছে— সংখ্যালঘু অবাঞ্ছিত প্রাণী। ষ্টীমারের ডেকে চুপচাপ বসে আছি—পায়চারি করছি—ষ্টীমার থেকে নামবার হুকুম নেই। বন্দী জীবন। জাহাজে করে উদ্বাস্তু-দের নিয়ে যেতে হবে। পুলিশ, কাষ্টমস আর ষ্টীমার কোম্পানী—ত্রহস্পর্শের যোগাযোগ ঘটলে তবে আমাদের ফেরা।

নদীর মধ্যে নোঙর করে দাঁড়িয়ে আছে ষ্টীমার। সন্ধ্যা নেমে আসছে—চোখের সামনে নিস্তেজ সূর্য্য ডুবে গেল—ঠাণ্ডা জলো হাওয়া। তীরে-লাগা নৌকার মাথায় দাঁড়িয়ে মাঝিরা নামাজ পড়ছে—দূর থেকে আজানের সুর ভেসে আসে।

ডেকের তিনকোণা অপরিসর জায়গা। কয়েকঘণ্টা বোধহয় পায়চারি করেছি। এখানে থাকার অসুবিধা কিছু নেই—তবু ভালো লাগে না—এই অনিশ্চিত বসে থাকা—এই নিঃসঙ্গ একক জীবন।

কলকাতার কথা মনে পড়ছে; মনে পড়ছে বিশুকে চৌকির ওপর বসে হাপরের মত হাঁপাচ্ছে। সলিল হয়তো বাসনাদির সঙ্গে—পুরোনো কাপড়ের হিসাব মেলাচ্ছে—। পণ্ডিতমশাই বারবার মাথা নেড়ে উমেশবাবুর কোষ্ঠি বিচার করছেন—আর মনে পড়ছে রাণীকে—সারাক্ষণই যার কথা মনে পড়ে।

* * * *

"তুই একটা কলকাতিয়া ভূত।" বিশু জল থেকে আমায় বলছে। আমি কিন্তু ঠাট্টায় বিরক্ত হয়ে জলে নামিনি। লেকের পাড়ে দাঁড়িয়ে বল্লাম; "জানতো আমি পিলসুজ—জলে পড়লে তার বুদ্‌বুদ্‌ও কাটবো না। সোজা পাতালে চলে যাবো।"

"আমরা বাংগাল দেশের ছেলে—জলের পোকা", বিশু হাসতো। বিশু আমার চেয়ে বছর চারের বড়—বি-এ পাশ করেই বিয়ে করেছিল। সময় পেলেই আমি হার্ডিঞ্জ হোষ্টেলে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করতাম—ও তখন এম-এ পড়ে। দুজনেরই সাহিত্যে ঝোঁক ছিল, তাই থেকেই আলাপ। ও বলতো, "ছুটিতে আমার সঙ্গে বরিশাল চল্, দাদা আছেন দেখবি, কোন অসুবিধা হবে না! নতুন জীবন দেখে আসবি।"

আমি সম্মতি দিতে পারিনি, "ইচ্ছে থাকলেও এবার যাওয়া হবে না, বাড়ীর সঙ্গে পাহাড়ে যেতে হবে।"

"তোদের বড় বড় কথা, একঘেয়ে জীবন কি করে ভাল লাগে' বলতো—কলকাতা, দার্জিলিং, শিলং কি তফাৎ?

সত্যি উত্তর দিতে পারিনি। ও বলতো "নিজে গিয়ে দেখবি চল্ কি জীবন—তেষ্টা পেলে জল খেতে হবে না—গাছ থেকে পাড়লেই ডাব—মিষ্টি জল। সুপুরি গাছের জঙ্গল যা চাস সব পাবি।" বলতাম, "ব্যস্ত হচ্ছিস কেন—আজ না হয় একদিন নিশ্চয়ই যাবো—নিজের চোখে দেখে আসবো।"

"বৌ তোর কথা কতো জিজ্ঞেস করে...জানিসতো আমি কি রকম সেন্টিমেণ্টাল...তোর কথা যে কত বলেছি ওকে"...একটু থেমে বলে, "জানি আমার বিয়ে করাটা

তোর পছন্দ হয়নি....আমিও বুঝি রোজগার না করে...বিয়ে করা উচিত নয়, কিন্তু কি করবো...দাদা বললেন... তাঁর ওপর আর 'না' করতে পারি নি।"

দাদার কথা বলতে বিশুর গলা ধরে আসতো, "দাদাকে যে না দেখেছে সে বুঝতে পারবে না। নিজে খুব বেশী লেখা পড়া করেনি, তাই আমাকে দিয়ে সখ মিটিয়ে নিচ্ছে। বি-এ পাশ করলাম তাতেও শান্তি হলোনা...এম-এ; ল' পাশ করতে হবে। অথচ বিয়ে করবো না বললেও চটে যাবে...নিজে মেয়ে পছন্দ করে এলো।"

"ভালই হয়েছে", আমি সায় দিলাম, "তোমার স্ত্রীর ভার তো উনিই নিয়েছেন, তবে আর ভাবনা কিসের ;"

"না ভাবনা আবার কিসের, দাদা থাকতে আমার আবার ভাবনা ?" বিশু একটা সিগারেট খেতে সুরু করে।"

* * * *

বিশুর দাদা সত্যিই অমায়িক ভদ্রলোক। প্রথমদিন আমাকে দেখেই জড়িয়ে ধরে বললেন, "তোমার নাম অনেক শুনেছি...বিশুর একমাত্র বন্ধু তুমি...ওকে একটু দেখা-শুনা করো বাবা, বিদেশে থাকে।" আমি হেসে ফেল্লাম, "কে কাকে দেখবে, ও যে আমার চেয়ে ৪।৫ বছরের বড়।"

"তাহলে কি হয়—তুমি ওর চাইতে কত বিচক্ষণ—ওটা একেবারে গেঁয়ো ভূত।" স্নেহের ভর্ৎসনায় অভিভূত বিশু

পেছনে দাঁড়িয়ে সজল চোখে হাসে ঃ দাদাকে নিয়ে পৌরাণিক থিয়েটার দেখিয়েছি…মুগ্ধ হয়ে দেখেন...সত্যি বলে বিশ্বাস করেন। সরল বিশ্বাসী মানুষ...সহজে কাউকে সন্দেহ করেন না। কলকাতা আসেন বাজার করতে... প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনে ফিরে যান্। এসেই বিশুর হাতে কিছু টাকা দিয়ে দেন...যাবার সময় অন্যমনস্কভাবে বলেন "হ্যারে বিশে, তোর কিছু দেবার থাকে তো দে, বৌদি কি যেন পাঠাতে বলেছে তোকে।"

বিশু একটা প্যাকেট এনে দাদার হাতে দেয়। আমাকে এসে বলে, বৌদির তো মাত্র দুটো ফরমাস...বাকি সব মায়ার জন্যে কিনে পাঠালাম।"

"ভাগ্যিস দাদা এসেছিল।"

মায়া বিশুর বৌ। সামান্য কটা জিনিষ কিন্তু এগুলো পাঠানোর মধ্যেও কত রোমান্স লুকিয়ে রয়েছে। দাদা সময় মত কাছে ডেকে বলতেন "ভায়ার এই জিনিস কটা নিতেই মাঝে মাঝে আসা। বৌদির নাম করে চাইলে তো আর লজ্জা পাবে না, কি বলো ?"

আমি অবাক হয়ে ভাবতাম...কি বিচক্ষণ দাদা।

* * * *

বিশু পাশ করে বেরিয়ে চাকরী নিলে...রোজগার বেশী নয়...তাতে তার আপত্তি নেই। বউবাজারের কাছে দুখানা কামরা নিয়ে তার বাসা। মাঝে মাঝে ওখানে যেতাম...

ঘরগুলো ছোট...তাহলেও ভাল লাগতো...ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে গল্প করতাম। রঙিন ভবিষ্যতের ছবি দেখতাম।

সেদিন শনিবার। বিশু ফোন করে জানিয়েছে...আমি যেন নিশ্চয়ই করে ওর বাসায় যাই। যেতে একটু দেরী হয়েছিল...ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেছি... চমকে উঠলাম ঘরে বিশু নেই একটি মেয়ে বসে চুল বাঁধছিল সে ধড়্মড়্ করে উঠে পড়লো, ত্রস্ত পদে অন্য ঘরে চলে গেল, "একটু বসুন, উনি এখনি আসছেন।" বুঝলাম মায়া এসেছেন...এইবার বোধহয় বিশুর সংসার পাতা সুরু হবে। ভাবতে বেশ লাগছিল...সামান্য সংসার...কিন্তু তবু মায়া-মমতায় গড়া ছোট্ট পরিবার...আমার মত ভেসে বেড়ানো জীবন নয়। বেশ খানিকটা বাদে বিশু এলো। একগাদা হাসি, "কি বৌর সঙ্গে আলাপ হলো।" উত্তর শোনবার আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, মায়াকে টানতে টানতে নিয়ে আসে। হি, হি করে হেসে বল্লে, "তোকে দেখে লজ্জা পাচ্ছে রে"।

আমার মার্জিত রুচি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে "ও কি করছিস্, এত তাড়াতাড়ি কিসের- আস্তে আস্তে আলাপ হবে এখন।" বিশু সে কথা শোনে না, মায়াকে একরকম জোর করে চেয়ারে বসিয়ে দিলে, "ফের তুমি অমনি কোরছ, তাহলে ভালো হবে না বলছি। তুমি না আমায় কথা দিলে ওর সঙ্গে কথা বলবে।" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হি

হি করে হাসে, "ওরে দেখ্ ও-ও হাসছে...।" মায়া আরও জড়সড় হয়ে বসেন। সেদিন ওখান থেকে বেরুতে দেরী হয়ে গেলো। সারা রাস্তা ওদের ছেলেমানুষীর কথা ভাবতে ভাবতে চলেছি। বেশ লাগছিল। কি মনে হলো মিষ্টির দোকানে ঢুকে ক'টাকার মিষ্টি কিনলাম। আবার ফিরে এলাম বিশুর বাড়ী। বাইরে থেকে চাকরের হাতে চাঙারিটা দিয়ে বল্লাম, "বৌমাকে দিয়ে দিস্।"

অনেকগুলো বছর কেটে গেছে···বিশু এখন পুরোদস্তুর সংসারী···ছেলে দুটো বেড়ে উঠছে···মায়া ছোট খাটো গিন্নীর মত চলন বলন নকল করে নিয়েছেন। আগের মত লজ্জা নেই···ছেলেরা আমায় খুব ভালবাসে তাই মাঝে মাঝে সিনেমা থিয়েটার দেখতে গেলে বিশু ছেলেদের ভার আমার ওপর দিয়ে যায়। বাচ্চাদের সঙ্গে আবোল তাবোল গল্প করি, ম্যাজিক দেখাই···তারা হাসে আমিও হাসি! মায়া বলেন, "ঠাকুরপোর বৌকে আর ছেলে মানুষ করবার ঝক্কি পোয়াতে হবে না। বাপই সব করবে।"

সেদিন আফিস থেকে বাড়ী ফিরে দেখি...বিশু বসে আছে। "কি খবর, কদিন দেখিনি যে", জিজ্ঞেস করলাম।

"মনটা ভালো নেই-রে...কদিন আর বাড়ী থেকে বেরুইনি...আজ...তোর কাছে এলাম।" একটু থেমে হঠাৎ প্রশ্ন করে "কি মনে হচ্ছে?" প্রশ্নটা কি সম্বন্ধে বুঝলাম না। তাকিয়ে রইলাম।

"বরিশালে গোলমাল হচ্ছে শুনছি, অথচ দাদার কোন খবর পাচ্ছিনা..." কথাটা সে শেষ করেনি। মনে হলো তাইতো...কাগজে গোলমালের খবর শুনি বটে তবে বিশুর দাদার কথা তো মনে হয়নি। তবু ওকে আশ্বাস দিলাম... "ঘাবড়াস না...আর দুদিন যাক, ঠিক খবর পাবি।" বিশুর মনটা সত্যই খারাপ ছিল। "এ তো একটু দুর্ভাবনা বটেই তার ওপর বাসা থেকে টাকা আনতেও পারা যাচ্ছে না, পাঠানোও যাচ্ছে না..."

"তাতে আর কি হয়েছে..."

"নারে তাহলে আমাদের চলে না....কোন মাসে আমার টাকার দরকার হয়, তখন দাদার কাছ থেকে আনিয়ে নিই, আবার দাদার টাকার দরকার হলে...আমার কাছে চেয়ে পাঠায়।

একটু সময় নিয়ে বললাম,···সব ঠিক হয়ে যাবে-রে.... কদিন যেতে দে।" বিশু উদাসভাবে বলে, "এই কদিন আগে টাইফয়েডে দাদার দুটো ছেলে মারা গেছে....কি জানি বাকি চারটে ঠিক আছে কিনা।"

আমি ধমক দিয়ে উঠলাম, "কি যা তা বকচিস।"

তারপর প্রায় দশদিন কোন খবর পাওয়া যায়নি। আমি প্রায়ই বিশুর বাড়ী যেতাম....যেন ক্রমশঃ গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে। রোজ একবার শেয়ালদহ ষ্টেশনে যায়···নিরাশ হয়ে ফিরে আসে। মায়া দু'একটা দরকারী কথা ছাড়া

চুপ করে থাকেন....বাচ্ছাগুলোও। থমথমে সাড়া বাড়ীটায় যেন আতঙ্কের ছাপ।

অপ্রত্যাশিতভাবে বিশুর টেলিফোন পেলাম...."হ্যাঁরে দাদা নাকি কাল কলকাতায় এসেছে।"

"কোথায় ? কবে ?" আমি লাফিয়ে উঠি।

"জানি না, দাদাদের সঙ্গে এক ভদ্রলোক এসেছেন.... তিনিই বললেন। তবে শেয়ালদহ ষ্টেশন থেকে কোথায় গেছেন তিনি জানেন না।"

আর চিন্তা করিস না....আমি খুঁজে বার করে দেবো। বিশুকে আশ্বাস দিলাম।

সব শুনে বাসনাদি বললেন, "কালকের অনেক লোক সলিলদের ক্যাম্পে গেছে....আমি খবর নিয়ে জানাব"

বাসনাদিকে কেমন যেন রোগা বলে মনে হলো। "আপনার শরীর কি ভালো নেই। কেমন শুকনো শুকনো লাগছে।"

বাসনাদি হেসে জবাব দিলেন, "না আমি ঠিকই আছি, তবে মানসিক যন্ত্রনা তো আছেই। এই উদ্বাস্তুদের সাহায্য করতে যাই, মনটা কেমন যেন করে ওঠে। মনে হয় ঈশ্বরের কত বড় অভিসম্পাত এদের ওপর।"

চুপ করে থেকে বললাম, "আপনি বলেই পারেন.... অসীম ধৈর্য্য"....কথা শেষ হতে পেলোনা, বাসনাদি গম্ভীর স্বরে বললেন, "চিতা চিন্তা, চিন্তা চিতা, চিতা মৃতদেহকে

দাহ করে কিন্তু চিন্তা জ্যান্ত মানুষকে দাহ করে অথচ চিন্তার শেষ নেই।”

বাসনাদির কথাগুলো এখনো কানে বাজছে, “চিতা চিন্তা, চিন্তা চিতা।”

সলিলদের ক্যাম্পেই দাদার খোঁজ পাওয়া গেল। একটা ঘরের কোণে পোঁটলার মত দলা পাকিয়ে সব বসে আছে। দাদা বৌদি, চারটে ছেলেমেয়ে। একঘেয়ে বর্ণনার প্রয়োজন দেখি না।

কতক্ষণ পর্য্যন্ত দু'ভায়ে একটা কথাও হয় না, বোধ হয় পাছে তাদের দুর্বলতা ধরা পড়ে। অনেকটা বাদে বিশু সামলে নিয়ে বলে, দাদা তোমরা এখানে কেন যাদের কলকাতায় কেউ নেই তারাই এখানে ওঠে”। দাদা ধীরভাবে উত্তর দিলেন, “এখানে না উঠলে হয়তো সরকারের সাহায্য পাবনা।”
বিশু অবুঝের মত বলে, “সে যাই হোক, আমি থাকতে তোমরা এ ভাবে থাকবে, হতেই পারে না।”

দাদার মুখে ম্লান হাসি ফুটে ওঠে, আমাকে সম্বোধন করে বলেন, “ও বাঁদরটাকে জিজ্ঞেস ক'রতো, ও ক'পয়সা রোজকার করে যে এতগুলো অপোগণ্ডকে পুষবে?”

কথাটা এত কঠোর সত্য যে কেউ চোখে জল রাখতে পারলাম না। বিশু এবার ভেঙ্গে পড়ে, “দাদা লোকে কি বলবে. ভাববে. ভাই আরামে বসে রইল, ওদিকে দাদা—”

"চুপ কর বাঁদর।" দাদা বকে ওঠেন, যে দিন ঘর-বাড়ী ছেড়ে, ছেলে—বৌ নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েছি, সে দিন থেকে লোকের কথায় কান দেবার মত অবস্থা আমার নেই।"

কথাবার্তা কতক্ষণ চলতো ঠিক নেই—নিজে একটা কথাও বলতে পারিনি -অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। বাসনাদি' সব ব্যাপারটাই মিটিয়ে দিলেন, "আমার মতে, বাচ্চাদের এখানে রাখলে কষ্ট হবে, তাদের নিয়ে আপনি চলে যান। দাদা বৌদি এখানেই থাকুন। ভয় নেই—আমরা যখন আছি, ওঁদের যাতে অসুবিধা না হয় তার ব্যবস্থা করবো।"

বিশুদের ছোট ঘর দুটো ভরে গেছে। ছটা বাচ্চা সারাদিন হৈ-চৈ করছে—মায়া যেন পাগল হয়ে যান এদের সামলাতে, তারপর দিদিরা আসেননি বলে তার মন কোথায় যেন খচ্ খচ্ করে। আহা, তাদের বাড়ীটায় যদি আরেকটু জায়গা থাকতো, তারা যদি সবাই মিলে থাকতে পেতো!

বিশু আমার কাছে আসে— আজকাল একটু উদাস উদাস হয়ে গেছে—কিছুই ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে বলে' "সব চেয়ে দুঃখ কি জানিস, শিবতুল্য দাদা, যে আজীবন শুধু আমার জন্যে খেটে গেল, আজ তার বিপদে কিছুই করতে পারছি না। যা রোজকার করি তাতে এই বাচ্চা চারটেকেই মানুষ করতে পারবো কিনা জানি না—দাদাকে কোথায় আনবো?"

চা/-১৩০-৭১

সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পাই না। অন্যমনস্ক হবার ভাণ করি।

"তোর তো অনেক চেনাশোনা আছে, ছাখ্‌না দাদার যদি কোথাও একটা চাকরী করে দিতে পারিস্।"

মুখ নীচু করেই বললাম, "চেষ্টা তো কর্‌ছি।"

এক যায়গায় ইন্টারভিউ দিইয়ে দাদাকে নিয়ে ফিরছিলাম—"ভায়া, কি দেখে লোকে আমায় চাকরী দেবে বলতে পারো? লেখাপড়া শিখিনি, জীবনে কখনো কাজ করিনি।"

বললাম, "তাতে কি হয়েছে, লোকে এখন বিশ্বাসী লোক চায় —"

দাদা আমার কথা শোনেননি, নিজের মনেই বললেন,— "বিপদ আমাদের মত লোকের। জমি ছাড়া কিছুই আমরা চিনি না—চাল ডাল তরি-তরকারী—এতো আমাদের কোন দিন বাজারে থেকে কিনতে হয়নি। ধানজমি থেকে লাউ-কুমড়োর মাচাটা পর্য্যন্ত সব গৃহস্থ বাড়ীতে পাবেই...তাছাড়া তামাক, সুপুরি কি নয়—নাঃ, মিছে তোমাদের জ্বালাতন করছি ভায়া।"

বললাম, "আপনি ঘাবড়াচ্ছেন কেন? বিশু আছে আমি আছি।"

"সেই তো আমার ভাবনা—আমার জন্যে বিশুর জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। আমি ওকে মানুষ করেছি—আমার

তখন সামর্থ্য ছিল—কিন্তু ও বেচারীর কি সামর্থ্য আছে যে আমাদের এতগুলো লোকের ভার নেবে ? অথচ সারাক্ষণই চেষ্টা করবে আমাকে সাহায্য করবার।"

দাদার চোখ এবার জলে ভ'রে আসে, "বিশু আমার বড় আদরের ভাই।"

সলিলের কথাবার্তাগুলো প্রথম প্রথম আমি মোটেই বরদাস্ত করতে পারতাম না। কেমন যেন বাঁকা বাঁকা কথা—সেদিন দাদার সঙ্গে দেখা করে ফিরছি—গেটের কাছে সলিল দাঁড়িয়েছিল, বললে, "আচ্ছা লোক জুটিয়েছেন তো। একেবারে রামায়ণ মার্কা।"

বুঝতে পারলাম না। বোঝবার চেষ্টাও করলাম না।

"বলি দাদা—ভাই, এ যেন রাম-লক্ষ্মণ। এমন ভ্রাতৃ প্রেম কলিতে দেখা যায় না।" ঠাট্টা ভেবে হাসবার চেষ্টা করলাম।

সলিল একটা কাগজের মোড়ক বার করে হাতে ধরিয়ে দিলে, "এই নিন, ধুতি আর শাড়ী আছে—ওদের দিয়ে দিন।"

বললাম, "কেন তুমি দিয়ে এস না।"

"পাগল হয়েছেন, তাহলেই চোখের জল, ভাববেন হয়তো ভিক্ষা দিচ্ছি···সঙ্কোচ, ব্যথা সে অনেক ব্যাপার।"

আমাকে তখনো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু এগিয়ে এসে বললে, "এইটাই এদের জীবনের সব চেয়ে বড়

ট্রাজেডি...যাবতীয় সব কিছু হারালেও এরা সঙ্কোচটা হারাতে পারে না। এই সঙ্কোচ, এই যে নিজেকে অন্যের গলগ্রহ বলে ভাবা এই হয় এদের কাল..." কথা শেষ না করেই কা'কে ডাকতে ডাকতে সে চলে গেল।

বিশুর সঙ্গে কদিন থেকেই দেখা হচ্ছে না। রাত্রে কোথায় টিউশানি করতে যায়, ফিরতে প্রায় নটা-দশটা বাজে। দাদা বৌদিও ছেলেদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

বাইরের উঠোনে দাদার মেজ ছেলের সঙ্গে দেখা... উপুড় হয়ে কাঁদছে....কোলে তুলে নিলাম, কি হলো পুতু-বাবু, কাঁদছ কেন—"

সে কথা বলে না। কেঁদে যায়—ওর দাদা কথাটা বুঝিয়ে দিলে, "ওর খিদে পেয়েছে। খুড়িমা রুটি, চা দিয়েছেন, তবু পেট ভরে নি।" কথা বলে ভোলাবার চেষ্টা করলাম...সে ভুললো না...মনে পড়লো বিশুর কথা, একদিন বলেছিল, "জানিস, আমার তো মনে হয় দুবেলা ভাতের খরচের চেয়ে টিফিনের খরচ বেশী।"

এ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান খুব কম...চুপ করে রইলাম।

"বাচ্চা হলে হবে কি...পেটের খোলগুলো এদের এখনো বড় আছে। আমার ছেলেদের মত তো শুকনো পেট নয়!"

জিগ্গেস করলাম, "কেন?"

"কেন আবার, দেশে তো আর খাবারের অভাব নেই... বাড়ীতে চিড়ে, মুড়ি, গুড় সব সময় বোঝাই থাকে। আমরা তো ছেলে-বেলায় সব সময় মুখ চালাতাম। এখানে এসে একটুকরো পাঁউরুটিতে কি এদের পেট ভরে"। একটু থেমে বলেছিল,....

"অবশ্য না পেয়ে আস্তে আস্তে খিদে মরে যাবে... তবে একটু সময় লাগবে।"

চিড়ে, মুড়ি এই অসুখ বিসুখের দিনে কলকাতায়

খাওয়ানো মুসকিল...পাউরুটির দাম ছ'আনা...তাতেও পেট ভরে না। আটা ময়দা পাওয়া যায় না, তবে আর টিফিন তৈরী হবে কি দিয়ে ?

অন্য ছেলেদের নিয়ে সামনের ঘরটায় খেলা করছিলাম। মায়া দু' একবার এলেন, কি যেন বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। কাজেরও একটু তাড়া ছিল তাই তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম...বাড়ীর গেট পেরুবার আগেই মায়া ডাকলেন, "শুনুন," আবার ফিরে এলাম। কি একটা পুরোনো মাসিক পত্রিকা হাতে দিয়ে মৃত্তস্বরে বললেন, মধ্যে একটা চিঠি আছে. পড়ে দেখবেন"। বুকটা ধড়াস করে উঠল। চিঠি কিসের ? কিন্তু কোন কথা জিগ্‌গেস করার সুযোগ না দিদেই মায়া চলে গেলেন। বাড়ী পর্য্যন্ত যাবার তর সইল না...আলোর নীচে দাঁড়িয়ে কয়েকটা লাইন বারবার পড়লাম।

"ঠাকুরপো, ওঁর শরীর খুব খারাপ। তবু সারাদিন খাটছেন। যে কোন উপায়ে যাতে কিছু রোজগার করতে পারি তার ব্যবস্থা করো। তা না হলে......

অসম্পূর্ণ চিঠি...বাড়ী ফিরে ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। কেন জানিনা রাণীর কথা মনে পড়লো, "রাণী, তোমার যদি এই অবস্থা হতো। এমনি অসহায় ভাবে পরের কাছে আবেদন জানাতে পারতে ? না...না ও চিন্তা করতে চাই না"।

রাণী, কোথায় তুমি, এসো আরো কাছে এসো পৃথিবীর সবাইকে ভুলে যেতে দাও, নিবিড় আলিংগনে আমায় সবকিছু থেকে পৃথক করে দাও" ।

চিঠি পড়ে বাসনাদি ম্লান হাসলেন, "ভাবোতো, এই মেয়েগুলোর কি অবস্থা...লেখাপড়া শেখেনি, কোন কোয়ালিফিকেসন নেই...কোন বাড়ীতে রান্নার কাজও করতে পারবেনা—সামর্থ্য নেই-- সঙ্কোচ আছে অথচ স্বামীর জন্য প্রাণ ভরা ভালবাসা--কিন্তু এ ভালবাসার—কি দাম পাবে বলতে পারো !"

আমি বল্লাম, "বাসনাদি, বড় কথা আমি বুঝি না—এর যা হয় একটা উপায় করে দাও, আমি কি করবো বল ?"

"জানি তোমার মত অপদার্থের দ্বারা কোন কাজ হবে না— আমি ওদের সঙ্গে দেখা করবো ।"

চলে আসছিলাম, বাসনাদি ডাকলেন, "যাবার সময় সলিলকে বলে যাও, ক্যাম্প-এ দুধ গরম করার সময় ও যেন নিশ্চয় থাকে ।"

পরের দিন দাদা এসে হাজির আমার বাড়ীতে--উস্ক-খুস্ক চুল কেমন যেন বিভ্রান্ত । মনে মনে ভয় পেলাম—কি হয়েছে দাদা, এত সকালে যে?"

"তোমরা মনে করেছ কি", দাদাকে এতো রাগতে কখনো দেখিনি। "আমরা আজ গরীব হতে পারি তাই বলে তোমাদের এত বড় আস্পর্ধা যে বাড়ীর বৌ-ঝিকে পরের বাড়ীর ঝি-গিরি করতে বল ?"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, "কি বলছেন" ?

"কে তোমাদের বাসনাদি না কে, সে বুঝি বৌমাকে নাচিয়েছে—কার বাড়ীতে ছেলে মানুষ করতে যাবে, ছুবেলা খেতে পাবে। আর পঁচিশ টাকা হাত খরচ পাবে"। দাদা রাগের চোটে কথা বলতে পারেন না।

"বেচারী বৌমা তাদের কথায় ভুলে, আমার কাছে অনুমতি নিতে এসেছেন"। এইবার তিনি কেঁদে ফেলেন, "মেয়েদের ইজ্জত বাঁচাবার ভয়ে বাপ-পিতাম'র ভিটে এক-কথায় ছেড়ে এলাম—এখানে এসে তাদের ঝিয়ের কাজ করাবো বলে ? তোমাদের সে দিদিটিকে খুব ছু'কথা শুনিয়ে দিয়েছি।"

বাসনাদির কথা মনে করে লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে গেলাম, মায়ার চিঠির কথা মনে পড়ল—দাদা যাবার সময় বলে গেলেন, "কিন্তু বিশু এখনও শোনেনি, দেখো একথা যেন তার কানে না ওঠে"।

কয়েকদিন আর বিশুদের বাড়ী যাইনি। প্রথম প্রথম যেমন এদের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে বেশ ভাল লাগতো, এখন আর তেমন লাগে না। সবটাই তেতো হয়ে গেছে। প্রায় দিন সাতেক বাদে ওদের বাড়ী গেলাম। বাইরের ঘরে বিশু শুয়েছিল—তারই সামনে সলিল, বললে, "কি ব্যাপার, কদিন আপনাকে দেখিনি যে!" জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'তুমি এখানে ?"

সে বল্লে, "বিশুদার শরীর খারাপ, তাই বাসনাদি—পাঠিয়ে দিয়েছেন।"

বিশু ঘুমুচ্ছিল...মুখ শুকনো, রুক্ষ চুল, নির্জীব ভাবে পড়ে আছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হয়েছে ?"

"বুঝতে পারছি না। জ্বর, হাঁপানি অনেক কিছু।"

"ডাক্তার এসেছে ?"

"আপনার ভরসায় থাকলে আসতো না। খবর পেয়েই বাসনাদি পাঠিয়ে দিয়েছেন।" খানিকটা চুপ করে থেকে বললে, "এখন সব পরীক্ষা চলছে। বাহ্যে, প্রস্রাব, বুক, রক্ত কি নয়...অবশ্য রায় এখনও বের হয়নি।"

একটু পরে বিশুর ঘুম ভাঙ্গল। আমাকে দেখেই তার ম্লান মুখে হাসি ফুটে উঠে, "কদিন তুই আসিসনি কেন ?"

মিথ্যা কথা বললাম, "অসুখ করেছিল।"

"এদিকে আমার কি অবস্থা, দেখ দেখি...জ্বরে পড়লে কি আমাদের চলে...তবু বাসনাদি আছেন, তাই ডাক্তার ওষুধ সব ব্যবস্থা করছেন। এরকম দয়া আর দেখিনি।" বিশু কঁকিয়ে কঁকিয়ে বলে।

সলিল শুকনো গলায় বললে, "থাক,, বাসনাদির আর গুণ বর্ণনা করতে হবে না...আবার তেষ্টা পেয়ে যাবে।"

সলিলটা যেন কি রকম, একথাগুলো না বললেই চলতো। আবার নিজে থেকেই বলে, "আমি কি আপনার জন্য কম করছি নাকি ? দেখি না কে এসে এমন দিন নেই, রাত নেই, সেবা করতে পারে ?"

ঘরে আর কোন কথা হল না...আধ ঘণ্টা বাদে সলিল চলে গেল...বোধহয় অন্য কোথাও ডিউটি দিতে। বিশু ইঙ্গিতে ওর কাছে গিয়ে বসতে বললে। বসলাম। "ছেলেটার মনটা সাদা। সত্যি খুব করে, কিন্তু বড় কাঠ কাঠ কথা শোনায়।"

বললাম, "ওর স্বভাবটাই ঐ রকম। তারপর অসুখ করল কি করে?"

"বেশী স্ট্রেণ হয়ে গিয়েছিল। আপিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, তারপর বিকেলে টিউশনি···তাছাড়া দুশ্চিন্তা···শরীর মন ঠিক রাখা শক্ত।" চুপ করে থেকে বল্লে, "ভেবেছিলাম টিউশনিটা ছেড়ে দেবো, ছাড়লেও চলে না···এই বাজারে পঞ্চাশ টাকা দেয়। কামাই করলে কিছু বলে না।"

"ঠিক আছে. ভাবছিস্ কেন, সেরে উঠেই কাজ করবি।"

"তা বটে," বিশু নিশ্বাস ফেলে, "মায়া, দেখ কে এসেছে?"

মায়া এসে ঘরে ঢোকেন, আমাকে দেখে বোধহয় লজ্জা পান, পাছে আমি বাসনাদির কথা পাড়ি। এক কোণে গিয়ে বসেন। "বললাম তোমায়, ওর অসুখ করেছিল তাই আসেনি," বিশু মায়াকে বলে।

কিছু একটা বলা দরকার মনে হল, "বাচ্চারা কোথায়, দেখছি না?" মায়া উত্তর দিলেন না, উত্তর দিলে বিশু, "পাড়ায়

খেলা করতে গেছে। সলিলদের কোন আত্মীয় এ পাড়ায় থাকে। তাদের বাড়ী ওরা এ সময় যায়।"

"দাদার খবর কি ?

"ও, শুনিসনি বুঝি, দাদা সকাল বেলায় এক জায়গায় তিনটে ছোট ছেলেমেয়ে পড়াচ্ছে, আর বিকেলে রেফুজী ক্যাম্প-এ ভলান্টিয়ারের কাজ করছে। দুপুরে এখানে আসে।" দম নেবার জন্য খানিকক্ষণ ও হাঁপায়, "জানিস বোধহয়, বাসনাদির সঙ্গে ঝগড়া করে ও বৌদিকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, সলিল আবার ফিরিয়ে এনেছে। অথচ কেন যে ঝগড়া হ'ল কেউ বলে না। বাসনাদি ত নয়ই, দাদাও না।"

মুখ ফেরাতেই মায়ার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। অন্যদিন হলে মায়া চোখ নামিয়ে নেন, কিন্তু আজ আমার দিকে চেয়ে রইলেন—নিষ্পলকপূর্ণ দৃষ্টি। এভাবে কোনদিন আমি মায়াকে দেখিনি। ঘোমটা খসে পড়েছে—সদ্য স্নান করা একমাথা ভিজে চুল—চোখের কোণে হাল্কা কালি—সঙ্কোচহীন —করুণ চাহনি। কপালে সিঁদুরের টিপ—অন্য দিনের চাইতেও বড়—জ্বল জ্বল করে জ্বলছে। আমি চোখ নামিয়ে নিলাম।

দাদার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম—আজকাল কেমন যেন ভয় ভয় করে। কথায় কথায় বিরক্ত হয়ে ওঠেন। বিশুর জন্য দুঃখ করলেন, "বেচারাকে আমরাই অসুখে ফেললাম।"

বাধা দিলাম, "না, না, তা কেন বলছেন।"

'সত্যিই তাই, বেচারা সারাদিন আমাদের কথা ভাবে,

এমন কি অসুখে শুয়ে শুয়েও ঐ এক চিন্তা কি করে আমাদের একটা পাকা ব্যবস্থা করবে।" একটু থামলেন, "না আমাদেরই ভুল হয়েছে, কলকাতায় না এসে অন্য কোথাও নেমে পড়লে পারতাম—যা হয় হত আমাদের হ'ত, বিশুদের আর জড়াতে হ'ত না।

"বিশু সেরে উঠবে শীগগীর···তারপর—"

"মাঝে মাঝে ভাবি, যে দুটো ছেলে ক'দিন আগে রোগে মারা গেল, তারা সুখে গেছে—না খেতে পেয়ে তো মারা যায়নি, আহা ঐ সঙ্গে যদি বাকিগুলোও—" কথা শেষ হতে পায় না, আমি ধমক দিয়ে উঠি, "কি সব বাজে বকছেন?"

ভদ্রলোক থতমত খেয়ে যান। আমার হাত দুটো ধরে মিনতি করে বলেন, "কাউকে বলবো না, সত্যি করে বলো বিশুর কি হয়েছে?"

"আপনি কেন উতলা হচ্ছেন জানি না, আর তিনদিনের মধ্যে ও ভাত খাবে।"

ওখান থেকে বেরিয়ে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। গেটের মুখে বাসনাদির সঙ্গে দেখা—সলিলকে নিয়ে কাপড়ের হিসাব করছিলেন।

"আজ ছ'টার সময় বিশুদের বাড়ী যেও, ডাক্তার রিপোর্ট নিয়ে যাবে।"

ভেবেছিলাম বাসনাদি হয়তো মায়ার চাকরীর কথা তুলবেন, কিন্তু সে দিক দিয়েও গেলেন না। আমিও সম্মতি জানিয়ে চলে এলাম যে ছ'টার মধ্যে হাজিরা দেবো।

ডাক্তার প্রেসক্রিপসন লিখছে, বিশু গেঙিয়ে যাচ্ছে, "আর ক'দিন ডাক্তারবাবু? আপিসে যে কামাই হচ্ছে—এ মাসে ক'টাকা মাইনে দেবে, ভগবান জানেন, ওদিকে টিউশনিটা গেল বোধ হয়—একটু কড়া ওষুধ দিন যাতে চট করে চাঙ্গা হয়ে পড়ি।"

ডাক্তার ম্লান হাসলেন, "ঘাবড়াবেন না বিশুবাবু, আমরা তো যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। একটু সময় নেবেই তো।"

"আর কতদিন ?– "

"তা কি ঠিক বলা যায়···চুপচাপ রেষ্ট নিন। বাকি সব আমি বাসনাদিকে বলে এসেছি···তিনি সব করে দেবেন।"

বিশু গুঁই গুঁই করে, আমাদের কি আর রেষ্ট নেবার উপায় আছে....বড্ড দুর্বল হয়ে পড়েছি, তাই বাধ্য হয়ে শুতে হয়েছে...তা না হলে কতদিন অল্প জ্বর গায় কাজ করেছি....কেউ জানতেও পারেনি"। ডাক্তার উঠলেন, বিশু আমায় বললে, "ব্যাগটা গাড়ীতে দিয়ে আয়।" ব্যাগ নিয়ে ডাক্তারের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। ডাক্তার গাড়ীর কাছে এসে নীচু গলায় বললেন. "আপনি..."

"হাঁ, কেন ?"

"বাসনাদি আপনাকে বলতে বলেছেন।"

"কি ?"

"মানে রোগটা," ডাক্তার বলবেন কিনা ভাবলেন, "রোগটা শক্ত।"

"বলুন কি হয়েছে ?

"বোধ হয় বড়রোগ"

"সে কি," আমি স্তম্ভিত হলাম।

"হাঁ, এক্সরে রিপোর্টে তাই বলেছে।"

চোখের সামনেটা অন্ধকার হয়ে গেল···নিমিষের মধ্যে বিশু, মায়া, দাদা, বৌদি, এক দংগল ছেলেমেয়ে··· চেহারাগুলো ভেসে উঠলো। মুখ দিয়ে কথা বেরুল না···

কিসের যেন শব্দে ফিরে তাকালাম, পেছনেই ঘোমটা মাথায় দিয়ে মায়া দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সব কথাই শুনেছেন বোধ হয়। মনে হলো যেন পাথরে খোদাই করা মর্মর মূর্তি। কেন জানিনা সেদিনকার জ্বল-জ্বলে সিঁদুর টিপটার কথা মনে পড়ে গেল, আর সেই সঙ্গে চোখের সামনে ভেসে উঠলো একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন। কত-গুলো 'কেন' আর 'কি' প্লেনের প্রপেলারের মত মাথায় ঘুরতে থাকে···সমুদ্রের মত অনন্ত জিজ্ঞাসা···।

পায়ের শব্দে চমক ভাংলো, ফিরে তাকালাম। সারেংগ্ এসে সেলাম করেছে। সাহেবের কাছ থেকে খবর এসেছে দু'তিনদিনের মধ্যেই নাকি আমাদের জাহাজ উদ্বাস্তুদের নিয়ে কলকাতা ফিরবে। কলকাতা ফেরায় কথায় বেশ ভালো লাগল। সারেংগকে বিদায় দিয়ে আরাম কেদারায় বসলাম। ভাবনা হয় প্রায় সাড়ে ছ-শ লোক নিয়ে পথে মুশকিলে পড়বো না তো! এত লোকের রান্না করা। কে জানে?

সংগে সলিল থাক্‌লে ভাবনার কিছুই ছিল না। এতগুলো লোকের ভার সে একাই নিতে পারতো। অদ্ভুত ছেলে।

সলিলের সংগে প্রথম আলাপটাও বেশ মজার। সেই কোলকাতার দাঙ্গার সময় চারিদিকে রেফুজি ক্যাম্প খোলা হয়েছে। আমাদের বাড়ীর কাছেই একটা কলেজে সেণ্টার খোলা হলো। উৎসাহ তখনই বেশী ছিল, তাই ব্যবস্থাপনার ভার নিয়েছিলাম। সেও এক বিরাট ব্যাপার—হাজার লোকেরও বেশী জড় হয়েছে—তাদের খাওয়া-দাওয়া থাকা পরা সব কিছুর ব্যবস্থা—এরপর মাথার ঠিক রাখা মুসকিল।

*   *   *   *

সেদিন সকাল বেলা সবে গিয়ে হাজির হয়েছি। দু'জন মেয়ে ভলাণ্টিয়ার এসে নালিশ করলো, "দেখুন, একজন ভলাণ্টিয়ার আমাদের যা তা বলে অপমান করেছে।"

"কিরকম"? জিগ্‌গেস করলাম।

"উনি দুধ গরম করছিলেন। চারতলার বাচ্চারা এখনো দুধ পায়নি। ওঁকে বললাম ওপরে দুধ পাঠাতে, তাই যা-নয় তাই বললেন।" রাগে গা জ্বলে গেল। আজকালকার ছোঁড়াগুলোর কি ভদ্রতা জ্ঞানটুকুও হয়নি? সংগে শোভাদি ছিলেন। বল্লাম, "এর জন্যে আপনারাই দায়ী। রাস্তার যাকে তাকে ধরে ভলাণ্টিয়ার করলে এই রকমই হয়।"

শোভাদির সংগে রান্না ঘরে গেলাম। শ্যামল রঙের একটি নধর ছেলে, একমনে দুধ জ্বাল দিচ্ছে।

ডাকলাম, 'শোন", তখনও আমি মনে মনে রাগছি। ছেলেটা উত্তর দিলো না। আবার জোর দিয়ে ডাকলাম, "ওহে শোন"।

"কি, আমায় বলছেন?"

"হাঁ, এদিকে এসো।"

দাঁড়ান, দুধটা নামিয়ে আসছি", নির্বিকার ভাবে সে দুধ জ্বাল দিলে। উনুন থেকে নামিয়ে গামছায় হাত মুছে এসে দাঁড়াল।

শোভাদি ধৈর্য হারিয়েছিলেন, "তুমি এদের—"

কথা শেষ হতে পেল না। ছেলেটি অন্যমনস্কভাবে বল্‌লে, "তুমি না আপনি? মানে?"

"মানে, আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করুন।"

"ইমপার্টিনেণ্ট," আমার পক্ষেও অসহ্য হয়ে পড়লো, "আপনি এদের অপমান করেছেন?"

"কাদের ?' মেয়ে ভলান্টিয়ার দু'জনকে দেখে বললে, "এই খুকি দুটিকে—কৈ নাতো !"

মেয়ে দুটি রাগে থরথর করে কেঁপে উঠলো, "আপনাকে দুধটা ওপরে তুলে দিতে বলেছিলাম, আপনি—"

"আমি তো কুলি নই যে দুধ মাথায় করে চারতলা উঠবো।"

"অন্যদিন তো দুধ ওপরে যায়।"

"যারা নিয়ে যায় তারা বোধ হয় নেই।"

আমি বললাম, "সেটা বুঝিয়ে বললেই তো হতো"

ছেলেটা এতটুকু গলা নামায় না, বলে, "ঐ আমার বুঝিয়ে বলা। খুকিরা যে রেগে গিয়ে আপনাদের খবর দেবে তাতো ভাবি নি। ভেবেছিলাম বাড়ী গিয়ে মা'দের কাছে নালিশ করবে।'

শোভাদি বেশ চেঁচিয়ে উঠলেন, "বেরিয়ে যাও এখান থেকে।"

"দুধ জ্বাল দেবে কে ?"

"তোমায় সে নিয়ে ভাবতে হবেনা। কেউ না দেয় আমি দেব।"

ছেলেটা হাসে, "এতো আর বাড়ীর ছেলেদের জন্যে একসের দুধ জ্বাল দেওয়া নয়—এক এক মণের কারবার—চেষ্টা করুন।"

দুধের জিনিসপত্রের হিসেব চুকিয়ে সে বেরিয়ে গেল !

তারপর আধঘণ্টা ধরে শোভাদি আমাদের দিয়ে চেষ্টা করলেন দুধ জ্বাল দেবার, কিছুতেই আর যুত হয় না, কিন্তু বেশী কষ্ট পেতে হলো না—এরই মধ্যে ছেলেটা ফিরে এলো ও যেন জানতই আমরা পারবো না—বিনা ভূমিকায় শোভাদিকে সরিয়ে কাজে লেগে গেল। দুধ নামিয়ে নিজের মনেই বলে "ছোঁড়াগুলো আজ সব গেল কোথায় কে দুধ ওপরে নিয়ে যাবে ? কি ভেবে বললে, "সব যেন আমারই দায়। যাই ওপরে দিয়ে আসি, তা না হলে আবার বাচ্চাগুলো খেতে পাবে না। চলুন দিদিমনিরা।"

দু-বালতি দুধ নিয়ে ও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো— মেয়ে ভলান্টিয়াররা সংগে যাচ্ছে। আমি আর শোভাদি হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছি। শুনতে পেলাম সিঁড়িতে উঠতে উঠতে সে জিগ্‌গেস করেছে, "আপনাদের বয়স কত ?" মেয়েরা কোন উত্তর দিল কি না শুনতে পাইনি। ছেলেটি বলছে শুনলাম "বেঁচে থাক্‌লে এই বয়সি আমার একটা বোন থাকতো।'

এই আমার প্রথম সলিলের সংগে আলাপ। মিষ্টি নয় মোটেই। এরপর দিন তিনেক বাদে সে এসে হাজির হলে। আফিস শোভাদির কাছে গিয়ে বললে, "আপনি কাপড়ের চার্জে আছেন ?"

"কেন ? " শোভাদি বিরক্ত হন।

"অনেকে কাপড় পায়নি তাই।"

"দেখ যা জান না তা বলো না। তুমি দুধের ডিপার্টমেণ্টে আছ, দুধে থাক কাপড়ে মাথা গলিও না।"

সলিল বেঁকে বসে, "তা বললে শুনবো কেন। আমরা ভলাণ্টিয়ার, কোথাও অব্যবস্থা দেখলে সেখানেই সাহায্য করবো।"

"তার মানে"

"মানে অনেকে কাপড় পায় নি। আবার অনেকে হয়তো প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাপড় পেয়েছে।"

শোভাদি আর সামলাতে পারেন না, [illegible] বলে কাপড় পায়নি সে মিথ্যে বলছে।" এই বার সলিলও রুখে ওঠে "দেখুন শোভাদি যা তা বলবেন না। এখানে যারা এসেছে একদিন তাদের অনেক কিছুই ছিল, আজ তাদের দুরবস্থা দেখে মিথ্যেবাদী ঠাওরাবেন না।" রাগের মাথায় একটা কাগজের চার্ট শোভাদির সামনে সে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, "এই নিন এইটা দেখলেই বুঝতে পারবেন কে কতগুলো পেয়েছে—আর কে কে পায়নি।" সলিল চলে গেল।

চার্টটা খুলে দেখলাম এক একটা ঘর—তাতে কজন লোক, কি নাম, কে ক'টা ক'টা কাপড় পেয়েছে সব লেখা রয়েছে। শোভাদি অবাক হলেন। "তাইতো এ কি ক'রে করলে?"

সেদিনকার সেই মেয়ে ভলান্টিয়ার কোণে বসে চা খাচ্ছিল, বললে, "আজ সকালে উনি সব ঘরে দুধ দেবার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে কে কটা কাপড় পেয়েছে, তার খানাতল্লাসী করেছেন, তার ফলেই এই লিষ্ট।"

বললাম, "যাই বলেন শোভাদি—ছেলেটা কাজের আছে।"

শোভাদি উত্তর দিলেন না—সলিলের লিষ্টটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ভলান্টিয়ারদের বলেন, "কমলা কতগুলো কাপড় নিয়ে চারতলায় এসো।"

এই সময় একদিন সলিল আমার বাড়ী এলো একটা ট্রাক চাইতে। কারণ জিগগেস করলাম—জবাব দিলে না, বললে, "বিশেষ দরকার আছে, বিশ্বাস না হয় এই নিন বাসনাদি চিঠি দিয়েছেন।" বাসনাদি ঐ একই অনুরোধ করেছেন। আপত্তি করলাম না, একটা ট্রাকের ব্যবস্থা করে দিলাম। বিকেলবেলা ড্রাইভার ফিরলে জিগগেস করলাম "গাড়ী কি কাজে লেগেছিল?" সে বললে, "ও বাবুর বাড় থেকে কয়েকজন মাইজি. বাচ্চা সব ট্রেনে তুলে দিয়ে এলাম।" মনে মনে হাসলাম। এ আর না বলার কি ছিল। সন্ধ্যেবেলা এক জায়গায় বাসনাদির সংগে দেখা হলো। খানিকটা ঠাট্টা করে বললাম, "আপনারা সবেতেই এত সিরীয়াস যে বাড়ীর কজন ষ্টেশনে যাবে—সেটাও কাউকে বলতে চান না।"

বাসনাদি বললেন, "কেন, কি হয়েছে?"

"হবে আর কি, সকালে চিঠিতে কিসের জন্যে ট্রাক দরকার—লিখে দিলেই তো পারতেন"।

"তার একটু মুশকিল ছিল। সলিলদের পাড়ায় জানলে হয়তো হৈ-চৈ করতো।'

"তার মানে" আশ্চর্য হলাম।

"জাননা বুঝি," বাসনাদি আবার হাসলেন, "যে ডাকা বুকো ছেলে পাড়া-বেপাড়ার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছে

মেয়েদের কুড়িয়ে এনে নিজের বাড়ীতে রেখেছিল। আজ তাদের কপালে মাথায় সিঁদুর পরিয়ে সরকারের জিম্মায় নিরাপদ জায়গায় রেখে এসেছে।"

কথা শুনে সত্যিই অবাক হলাম। বাসনাদি বললেন, "তাহলেও পাড়ায় খানিকটা জানাজানি হয়েছে—অনেকেই এখন মারমুখো। তাই বাড়ী ছেড়ে আমার এখানে আস্তানা গেড়েছে।" বাসনাদি যে সলিলকে কতটা স্নেহ করেন তা তাঁর প্রত্যেকটি কথায় প্রকাশ পাচ্ছে।

এরপর নেতাজীর জন্মদিনে ওর সংগে আমার দেখা, বিরাট শোভাযাত্রা বেরিয়েছে—তা দেখতে জড় হয়েছে রাস্তার দুধারে লোক।

নিজে ভোরবেলা প্রভাত-ফেরিতে বেরিয়েছিলাম। বাড়ী ফিরতে বেশ বেলা হয়ে গেছে—খিদে পেয়েছে যথেষ্ট —একটু তাড়াতাড়িই বোধ হয় হাঁটছিলাম। শম্ভুনাথ হাসপাতালের মোড়ের মাথায় সলিলের সংগে দেখা। ফুট-পাথে বসে—কাঁসার থালায় ছাতু মেখে খাচ্ছে। আমায় দেখে হাত তুলে নমস্কার করলে। নিজের থেকেই বললে, "বড় খিদে পেয়েছিল—খেতে বসে গেলাম।"

ভাবলাম—কি জানি আমার সংগে দেখা হওয়ায় লজ্জা পেল কিনা। ও কিন্তু বলে চললো, "পকেটে বেশী পয়সা ছিল না, ছাতু খেলে সস্তায় পেট ভরে। তাছাড়া

পুষ্টিকর, কি বলেন?" সায় দিয়ে কি বলেছিলাম মনে নেই, তবে এখনো তার ফুটপাথে বসে তৃপ্তিভরে ছাতু খাওয়ার ছবিটা বেশ মনে আছে।

বিশুর দাদাকে খুঁজতে প্রায়ই যেতাম শেয়ালদহ ষ্টেশনে। সে এক বিরাট ব্যাপার। প্রায় সারা ষ্টেশন কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। কয়েক হাজার উদ্বাস্তুর ভিড়—তাদের চিরাচরিত রূপ। কাশী বিশ্বনাথের দল—হাজার হাজার লোক খাওয়াচ্ছে—রাজাকাটরাকে ধন্য ধন্য করছে সবাই। বিভিন্ন সেবাদল তাদের বিচিত্র নামের পতাকা টাঙ্গিয়ে—তথাকথিত সেবার কাজে ব্যস্ত। সারাক্ষণই হৈ চৈ, হাংগামা। আমরা যারা বাইরের দর্শক লোক খুঁজতে গেছি—তাদেরও সংখ্যা কম নয়। বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখছি—অদ্ভুত চিড়িয়াখানা!

কত রকমের কথা কানে আসছে—সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন! কাগজে যা বিবৃতি পড়ি—বেশীর ভাগই একই ধরণের কাহিনী—বর্ণনায় কেউ কম যায় না। দু-একটা নতুন ধরণের ঘটনা মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। কোন এক বুড়ি বুঝি দু-দিন হেঁটে এক রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে এ রাজ্যে এসে পড়েছে—সংগে তার কতগুলো নোট ছিল—টাকা ত্রিশেক হবে। এ রাজ্যে এসে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। ভলান্টিয়াররা সুবিধা দেখার জন্যে সারাক্ষণ মোতায়েন। তাদের মধ্যে একজন, নাম বুঝি তার কমল—বুড়ির কাছ

থেকে টাকা নিয়ে টিকিট করতে গেল। ফিরতে দেরী দেখে বুড়ি ভয় পায়। লোকজন ডাকে, "কে যেন একটি ছেলে টাকা নিয়ে গেল—টিকিট এল না।"

বেশ হৈ চৈ পড়ে গেছে—একটু পরে ছেলেটি হাজির—বল্লে, "ওমা, এই টুকু'তেই ভাবতে স্থুরু করেছেন পাছে আপনার পাঁচটা টাকা মেরে দিই—ছিঃ ছিঃ, এই নিন টিকিট আর বাকী টাকা।"

বুড়ি বিশেষ লজ্জিত হয়, "না বাবা বুঝতেই পার, যা বিপদের মধ্যে দিয়ে আসছি।"

ছেলেটি ভালো, বলে, "এ রকম অনেক শুনেছি, লোকের উপকার ক'রে তুকথা না শুনলে চলবে কেন?" নিজের ঘাড়ে করে বুড়ির পোঁটলাটা ট্রেনের কামরায় তুলে দেয়।

ষ্টেশনে গাড়ী থামলে মাঝে মাঝে এসে সে দেখা করে যায়। তন্দ্রার ঝোঁকে বুড়ি কখন ঘুমিয়ে পড়ে। ছেলেটিকে বলে, "আমি একটু শুচ্ছি তুমি নজর রেখ বাবা।"

ছেলেটি হাসে "দেখবেন পরে আবার অন্য কিছু নিয়েছি বলবেন না যেন।" বুড়ি নিজের কথা মনে পড়ায় লজ্জায় ছি ছি করে, জিভ কাটে, চোখে জল এসে পড়ে।

কিন্তু ঘুম ভাংগলে বুড়ি চমকে ওঠে—তার গেঁজ কেটে কে টাকা নিয়ে গেছে, কোন হদিস নেই! শেয়ালদায় এসে গেছে, কিন্তু এর মধ্যে আর সে ছেলেটির খোঁজ পায়নি। নিঃসহায়, নিঃসম্বল বুড়ি ছেলেমানুষের মত কাঁদছে।

অন্য ধরণের ঘটনাও কানে আসে। সেদিন ষ্টেশনের বাইরে এক জায়গায় ভিড় জমেছে দেখে এগিয়ে গেলাম,

বিশেষ কিছু নয়—ট্রাকে লোক ভর্তি করা হচ্ছিল—কোথায় পাঠানো হবে বলে—বোধ হয় একটু বেশী লোক চাপানো হয়েছিল—তাই একটি মেয়ে পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে—ভিড়ের মধ্যে সকলেই যুক্তি দিচ্ছেন, জল দিলে ভাল হয়—এখুনি তুলে নেওয়া উচিত—আরো কত কি! একটি ছেলে চট করে ভীড় ঠেলে আসে—মেয়েটাকে কোলে তুলে নেয়—ফার্ষ্ট-এড-ক্যাম্পের দিকে নিয়ে গেল। দূর থেকে দেখেই বুঝলাম—সলিল। যারা ভীড় করেছিল তারা অনেকেই মতামত প্রকাশ করলে—এটা ঠিক উচিত হয়নি। যারা ষ্ট্রেচার আনতে গিয়েছিল—তারা এসে রেগে অস্থির—এত

কষ্ট করে তারা ষ্ট্রেচার আন্‌লে অথচ তা' ব্যবহার করার সুযোগ পেলে না!

সলিলের সঙ্গে যখন দেখা হলো, সে বললে, "এই হলো আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদের মজা—এরা কেতাদুরস্ত চালেই অস্থির—কাজের বেলা অষ্টরম্ভা। মেয়েটা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে--তাকে তুলবার মুরোদ নেই অথচ টিপ্‌পুনি কাট্‌তে ওস্তাদ!"

জিগ্‌গেস করলাম, "এখানে কাদের হয়ে কাজ কর্‌ছো?"

"এক ছাত্র সংঘের তরফ থেকে," একটু থেমে বলে, "ভলান্টিয়ার ডজন দরে—তবে ঐ এক ব্যাপার। কোনো খবর রাখে না—কতলোক আসছে—কজন খেতে পেল, কতজন খায়নি—কিছুরই পাত্তা নেই।"

বললাম, "অনেক সেবাদল রয়েছে—তবে আর ভাবনা কি—"

"ওতেই তো ভাবনা। এদের মধ্যে ভাসুর ভাদ্দর বৌএর সম্পর্ক—যে যার নামের সাইন বোর্ডের তলায় বসে আছে—এক সেবাদলের সীমানা ছাড়িয়ে যদি কেউ অন্যদলের সীমানার মধ্যে এসে পড়ে, তবে তার অবস্থা সংগীন—অনেকটা বিনা পারমিটে বিদেশী রাজ্যে এসে পড়লে যেমন হয়।"

বললাম, "কৈ কোন স্কাউট্‌কে তো দেখ্‌ছি না।"

সলিল হো হো করে হেসে ওঠে। "আপনি পাগল হয়েছেন, ওরা আসবে এখানে—ওরা যাবে ক্রিকেট খেলায়

ভিড় সামলানোর নাম করে খেলা দেখতে," কি ভেবে আবার একচোট সে হাসে, "তার চাইতে মজা হলো গার্লস্‌গাইড—জানি না এদের উদ্দেশ্য কি—তবে লাটসাহেবের বাড়ী চা খাওয়া ছাড়া তারা আর কিছু করে না। এরা সব সৌখিন মানুষ. সাজ দেখাতে যায়, কাজ দেখাতে যায় না।"

এককালে নিজে স্কাউট ছিলাম—তাই জবাব দেবার চেষ্টা করলাম, "না না, তা ঠিক নয়—মানে—দেখো—"

"অনেক দেখেছি—এই যে বললাম—সত্যিকারের সেবা করতে গেলে মনটা অন্য রকম হওয়া চাই। আজ দেশের এত বড় দুর্দ্দিনে…কজন মেয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েছে বলতে পারেন…শুনেছি তো এরা মায়ের জাত, দয়ার শরীর…কৈ হাজার হাজার মেয়ে যখন এখানে অপমানিত, লাঞ্ছিত…তারা কোথায়? এখনও তারা বিলাসে মেতে আছে, সারা মুখে চুনকাম করছে…স্বামী কিংবা প্রিয়র সংগে সোহাগ করছে" সলিল আজ থরথর করে কাঁপছিল। এরকম কথা সে বলতে পারে কখনো ভাবিনি।

নিজের মনেই সে বললে, "ধন্য বাসনাদি ও যেন এদেশের মেয়ে নয়…যতটা সময় পারে এই নোংরার মধ্যে পড়ে আছে…কি অক্লান্ত সেবা!"

বাসনাদি এই ষ্টেশনের মধ্যে…প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারিনি…সত্যি আশ্চর্য্য ভদ্র-মহিলা।

পণ্ডিত মশায়ের কাছে সংস্কৃত নাটক পড়ছিলাম—সলিল

এসে হাজির—কি একটা দরকার ছিল। কেন জানি না—পণ্ডিত মশায়কে বললাম, "দেখুন তো এর হাতটা কি রকম?"

পণ্ডিতমশাই সলিলের হাতটা টেনে নিলেন, দু'একটা রাশি, নক্ষত্রের কথা জিগ্‌গেস করলেন, "মোটামুটি তো লোকটা ভালই দেখা যায়।"

বললাম. "সে তো আমিও জানি, আর কি দেখলেন"।

"কি জানতে চান বলুন"?

"ধরুন এই টাকা পয়সা," আমি স্পষ্ট করেই বললাম।

পণ্ডিত মশাই হেসে উঠলেন, "আপনারা বিচক্ষণ লোক—যার মনটা ভাল বললাম, তার টাকা পয়সা হবে কিনা জিগ্‌গেস করছেন?"

"কেন?"

উনি একটা শ্লোক আওড়ালেন—যার মানে "টাকা তারই হয় যে মৎলবী—সরল মানুষ টাকার দেখা পায় না"।

শ্লোকটা সলিলের বেশ ভাল লেগেছিল, বললে, "না আমাদের ঋষিরা বুদ্ধিমান ছিলেন দেখ্‌ছি।"

ও চলে যাবার পর পণ্ডিতমশাই আমায় জিগ্‌গেস করেছিলেন, "ওর বাড়ীতে কে আছে?"

উত্তর দিতে পারলামনা—কারণ সত্যিই এতদিনে সে খোঁজ নেওয়া হয়নি। কারুর কথাও ও বলে না—যার কথা ওর মুখে সময় অসময় শুনি—সে বাসনাদি।

"ওকে একটু সাবধানে থাকতে বলবেন।"

"কেন বলুন তো" ঔৎসুক্য প্রকাশ করলাম।

"তা বলতে পারি না, তবে সময়টা ভালো নয়—একটু সাবধান করে দেবেন।" পণ্ডিতমশাই কাগজের ওপর ছক কাটতে লাগলেন।

কিন্তু সলিলকে সাবধান করারও সুযোগ পেলাম না। সেই দিনই রাত্রিবেলার কথা···দাদার সঙ্গে দেখা করে বাড়ী ফিরছিলাম···বিশুর কথা ভেবে মনটা ভালো ছিল না। ওর জীবনের অবাঞ্ছিত ট্রাজেডি কেমন যেন উতলা করছিল··· এখনো কাউকে রোগের কথা বলা হয়নি···মায়া সবই জানেন, অথচ না জানার ভান করেন। ভাবলাম ওদের বাড়ীটা একবার ঘুরে যাই।

শেয়ালদহ ষ্টেশনের কাছে যখন পৌঁছেছি···প্রায় রাত দশটা। নিতাই-এর সঙ্গে দেখা। জিগগেস করলাম, "এখনো বাড়ী যাওনি ?"

"না সলিলদা এখনো রয়েছেন যে, এক সঙ্গে ফিরবো।" নিতাই সলিলের ডান হাত, বললে, "রাতের গাড়ীতে একটি মেয়ে এসেছে···তার সাতকুলে কেউ নেই···কথাবার্ত্তা বলে না···তাই নিয়ে আটকে পড়েছি···"

ভাবলাম, আজ আর বিশুর বাড়ী না গিয়ে সঙ্গে যখন গাড়ী রয়েছে সলিলদের ছেড়ে দিয়ে এলে হয়।

বললাম, "তোমাদের কি খুব বেশী দেরী হবে, তা না

হলে গাড়ী করে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে আসতে পারি।"

নিতাই আনমনা হয়ে উত্তর দেয়, "চলুন, দেখি সলিলদার হল কিনা?"

ষ্টেশনে ঢুকতেই ওদের সঙ্গে দেখা। আলোর নীচে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে···তার সামনে সলিল ও আরো দুজন ভলান্টিয়ার।

কাছে এগিয়ে গেলাম, শুনলাম সলিল বলছে, "বলুন আপনার কি হয়েছে?"

মেয়েটি কোন জবাব দেয়না, হাত দিয়ে মুখটা চেপে রাখে···চোখ দিয়ে নীরব ধারা নেমে আসে।

জিগ্‌গেস করলাম, "কি হয়েছে?"

"বুঝতে পারছিনা" সলিল এতক্ষণে আমার দিকে তাকায়, "কি বিপদ বলুনতো, কোন কথাই কইছে না। বলুন, আপনার কি হয়েছে? আমরা যতদূর পারি···সাহায্য করবো··· বলুন?"

মেয়েটি তবু কিছু বলে না, জোরে কেঁদে ওঠে। সলিলকে বুঝিয়ে বললাম, "আহা মাথা গরম করোনা, আস্তে আস্তে জিগ্‌গেস করো"।

সলিল রেগে ওঠে, "এক ঘণ্টা সাধ্যি সাধনা ক'রেছি··· মিনতি, চোখের জল, সব হয়ে গেছে···অথচ একটি কথাও বের করতে পারলাম না।"

বাধা দিলাম, "তোমরা সব যাও দেখি···আমি এর সঙ্গে কথা বলছি।"

অনিচ্ছাসত্ত্বেও এরা সরে গেল, মেয়েটি যুবতী. বোধ হয় গৃহস্থ বৌ…মাথায় সিঁদুরের আভা দেখা দিচ্ছে….শতচ্ছিন্ন রঙ্গীন কাপড় দিয়ে লজ্জা বাঁচাবার ব্যর্থ চেষ্টা।

খুব নরম স্বরে বললাম, "আপনি বসুন।"

মেয়েটি কোন আপত্তি করল না…টপ করে বসে পড়ল…বোধ হয় এতক্ষণ এরা বসতে দেয়নি। এরপর কি দিয়ে কথা সুরু করা যায় ভেবে পেলাম না…আবোল তাবোল বকে মরলাম…ভারত পাকিস্থানের কথা, উদ্বাস্তুর কথা, অথচ কি আশ্চর্য্য…মেয়েটি কোন উত্তর দেয় না….শুধু ইঙ্গিতে জানায়, তার জল চাই।

বুঝলাম আজ আর কথা ব'লে ফল হবে না—সলিলকে বললাম, "বরং এ'কে ক্যাম্পে নিয়ে চলো—দু'এক দিন জিরোতে দাও—পরে সব জানতে পারা যাবে।'

সলিল কোন আপত্তি করলনা—কিন্তু আশ্চর্য্য সেই মেয়েটির ব্যবহার—উঠতে বললেও ওঠে না—চুপ করে কেমন যেন বসে থাকে।

সলিলের পক্ষে এ অসহ্য, "উঠুন শীগগীর, নইলে—" কথা শেষ হতে পেল না। এত জোরে কথাটা বলা হয়েছে যে মেয়েটী উঠতে গিয়ে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়ে—কেমন যেন ভ্যাবলার মত তাকায়—তারপর "মাগো" বলে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে যায়।

"এ তো আচ্ছা বিপদ" সলিল তাড়াতাড়ি জল নিয়ে আসে।

হাঁটু গেড়ে ব'সে চোখে মুখে জল দেয়। মেয়েটি বোধ হয় আরাম পায়—দীর্ঘশ্বাস ফেলে—হাতটা গাল থেকে খসে পড়ে।

বললাম, "ওকে চুপচাপ শুয়ে থাকতে দাও, বড্ড শক্ পেয়েছে।"

সলিল উঠে আসছিল, কি ভেবে আবার বসে পড়ে। মুখ নীচু করে—মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে. সমস্ত শরীর ওর থর থর করে কাঁপে, "ভগবান, একি শাস্তি !"

সলিল উঠে দাঁড়ায়—তার চোখের কোণ চক্ চক্ করে ওঠে।

কি হ'ল বুঝতে পারলাম না—সলিল কেন অমন হয়ে গেল—মেয়েটা এতক্ষণ গালে হাত দিয়ে কি চেপে রাখার চেষ্টা করছিল—এগিয়ে গিয়ে নীচু হলাম—দেখলাম কস্কা দিয়ে গালের উপর লেখা—কোন দিন ওঠানো যাবে না—খোদাই করা হরপ– "এ মেয়ে আর সতী নয়" !!

চোখকে বিশ্বাস করা যায়না। বর্বরতার কোথায় উঠ্লে মানুষ নারীর উপর অত্যাচার করে—কলঙ্কের ছাপ মুখের উপর খোদাই করে দেয়! সে দিনের পর সলিলের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। হয়তো আর হবে না। হয়তো শুনবো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন বস্তিতে আগুন লাগিয়ে সে সরকারের কাছে ধরা দিয়েছে। হয়তো শুনবো রিলিফের

কাজ সে আর করে না—হয়তো দেখবো সে ঘোর সংসারী -স্বার্থপরতার গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে বন্দী করেছে।

জিজ্ঞাসা করি সলিলের মত যারা সত্যিকারের মানুষ তাঁদের স্থান কোথায়—এই অপরিসর বর্বরতার রাজত্বে ?

সলিলের কোন খবর না পেয়ে মন বেশ খারাপ ছিল—বুঝতে পারতাম বাসনাদি মুখে কিছু না বললেও, মনে মনে তার কথা কতখানি চিন্তা করেন।

এমনি এক সকাল বেলায় উমেশ এসে হাজির। নিজে থেকেই হাঁক দিয়ে বলে, "চট করে একটু চা খাওয়া দেখি—শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে।"

চা করতে বললাম। উমেশ আমার কলেজের বন্ধু কলকাতায় সরকারী অপিসে বড় কাজ করে।

জিগ্‌গেস করলাম, "এত সকালে তোমার আগমন ?"

"বিশেষ কিছু নয়, কাগজে একটা ষ্টেটমেণ্ট পাঠাব ভাবছি তাই লিখে দিতে হবে," উমেশ সহজ ভাবে বলে, "কেন জানিনা লেখা জিনিষটা আমার ধাতে সয়না। অথচ ঘটনাটা 'ইণ্টারেষ্টিং', কাগজে ছাপানো দরকার।"

বললাম, "বেশ তো বল্ না, সে রকম বুঝলে লিখে দেব নিশ্চয়।"

"আমার মামা সিলেটে থাকতেন জানিসতো—মোটামুটি অবস্থা ভালই ছিল।"

"কে বল তো ? তোর সেজ মামা—খগেনবাবু ?" ঔৎসুক্য প্রকাশ করি।

"হাঁ, ওদের ওখানেই তোকে নিয়ে গিয়েছিলাম।" পুরোণো দিনের কথা মনে পড়ে গেল, "সেদিনগুলো বড় সুখে কেটেছে। অতীনদা, লালু…তোর মামাতো ভাইরা,…তারা কোথায় ? "

"ওরা কলকাতায় ভালো কাজ করে। শুধু মামা আর মামী সিলেটে ছিলেন সম্পত্তি দেখাশুনা করতে।"

"সেকি, শুধু ওঁরা দুজন ?" আমি বিস্ময় প্রকাশ করি, "এই দাংগার সময়েও ? "

উমেশ সায় দিয়ে বলে, "এবার যখন গোলমাল সুরু হয় আমরা চিঠি লিখলাম চলে আসতে। ওঁর প্রতিবেশীরা আসতে দিলে না, "আপনি যেতে যাবেন কেন ? আমরা

রয়েছি আপনার কোন অনিষ্ট হতে দেব না।' এ কথায় কোন ভরসা না পেলেও মামা দেখলেন ঝগড়াঝাটি ক'রে চলে আসা মুসকিল, তাতে হয়তো আরও বিপদ"—

উমেশ আধ ঘণ্টা ধরে বক্‌বক্‌ করে গেল, যা গুছিয়ে নিলে দাঁড়ায়—ওর মামা খগেনবাবু এদিকে আসতেও পারছেন না, অথচ মনে শান্তি নেই—ভয়াবহ ঘটনা সব কানে আসছে—কলকাতা থেকে আত্মীয়রা চলে আসার জন্যে অনবরত চিঠি লিখছে। নিরুপায় হয়ে তিনি প্রতিবেশীদের কাছ থেকে চলে আসার অনুমতি চান—তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে, "তা কখনো হয়—আপনি চলে যাবেন!"

"আজ্ঞে আমার স্ত্রী বড় ভয় পাচ্ছেন, তাছাড়া বয়সও হয়েছে—"

তারাও নাছোড়বান্দা, "দেখুন অনেকেই সিলেট ছেড়ে চলে গেছেন। আজ আপনিও যদি যান, কার কাছে আমরা মুখ দেখাবো বলতে পারেন? সবাই ভাববে আমরা নিশ্চয়ই সংখ্যালঘুদের ওপর জুলুম করছি—"

খগেনবাবু মনে মনে ভাবেন, এত সত্যি কথাই, তবু মুখে বলেন, "আজ্ঞে তা নয়, এই দেখুন কলকাতা থেকে চিঠি এসেছে…সেজ ছেলের বড় অসুখ…একবার দেখে না এলে—"

ভদ্রলোকেরা টেনে টেনে হাসেন… "বুঝতে পেরেছি… আর আপনার থাকবার মন নেই। কি করবো বলুন

জোর করে তো আর কাউকে ধরে রাখা যায় না। তা'হলে চলেই যান…"

খগেনবাবু আশার আলো দেখেন, "আমি শীগ্‌গীর ফিরে আসবো—এই —"

কথা শেষ হতে পায় না, একগাল হেসে প্রতিবেশীরা অনুরোধ জানায়, "আজ্ঞে যদি চলেই যাচ্ছেন এই গরীবদের প্রতি একটু দয়া করতে হবে--মানে, ধরুন, আপনার আস্‌বাব পত্রগুলো ও কছু নগদ টাকা দান করে যেতে হবে। আপনার সংগে আমাদের অন্যরকম সম্পর্ক তাই ভিক্ষে চাইছি।"

খগেনবাবু প্রমাদ গণলেন, এ তো অনুরোধ নয়, এযে মোলায়েম দাবী—তারা যা চেয়েছিল দিয়ে আসতে হ'ল—প্রতিবেশীরা জয়ধ্বনি করে তাঁকে ট্রেণে তুলে দিয়ে আসে, কিন্তু তাতেও রেহাই নেই। মাঝ পথে কারা বুঝি ট্রেণে চড়াও হয়ে অবশিষ্ট টাকা কড়ি ছিনিয়ে নিয়ে যায়। খগেনবাবুর চিনতে ভুল হয় নি—তাঁর প্রতিবেশীদের কয়েকজন এদের মধ্যে রয়েছে।

"বিশ্বাস করবি, মামা আর মামী শেয়ালদায় নেমেছেন শুধু পরণের কাপড়টুকু প'রে—আর একটি জিনিসও নেই।"

"সত্যি চমৎকার", ঘটনাটা গল্পের মত লিখে খবরের কাগজের আপিসে পাঠিয়ে দিলাম।

ক'দিন পরে উমেশদের বাড়ী গিয়েছিলাম। বেশ একটু হৈ চৈ হচ্ছে। বাইরের বারান্দায় খগেনবাবুর সংগেই দেখা। আগের চাইতে রোগা হয়ে গেছেন। জিগ্‌গেস করলাম, "কি ব্যাপার, বাড়ীতে হৈ চৈ কিসের?"

"সে কথা আর বল না, লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আসছে।"

কৌতুহল হ'ল, "কি হয়েছে?"

"নিজে রেফুজী তাই রেফুজীদের উপর আমার সহানুভূতি বেশী। একটি ছেলে সেও রেফুজী, অভাবে লেখাপড়া করতে পারছিল না, তাই এনে বাড়ীতে রেখেছিলাম। ভাবলাম, খাওয়া থাকার ভারটা নিলে হয়তো পাশ করে যাবে। ক'দিন বেশ ছিল।" খগেনবাবু থামেন

বললাম, "তারপর?"

"আজ সকাল থেকে সে ছোকরা উধাও হয়েছে, কোথায় গেছে, কেউ জানে না—সেই সংগে আমার ক্যাস বাক্সটাও—তাতে ছিল শ'তিনেক টাকা, আর কয়েকটা খুচরো গয়না।"

"আশ্চর্য্য," বিস্ময় প্রকাশ করি।

"আমার কি মনে হয় জানো" খগেনবাবু থেমে থেমে বলেন, "মনে হয় আমাদের—এই উদ্বাস্তুদের সত্যিকারের বন্ধু কেউ নেই—সবাই আমাদের লুটে নিতে চায়।"

তাঁর কথায় নিরাশার সুর—মিথ্যে ভরসা দিতে পারলাম না।

পণ্ডিত মশাইএর গণনা বড় একটা ভুল হয় না। সেদিনও আমায় বলেছিলেন "দেখবেন কয়েকদিনের মধ্যেই হঠাৎ আপনাকে বিদেশ যেতে হবে"। ফললোও তাই। আগে এটা নিজের দেশ হলেও এখন তো বিদেশ বটেই। বলা নেই কওয়া নেই চলে আসতে হল।

এই মেঘনার' উপর বসে মনে হচ্ছে পণ্ডিত মশাই এখন জাহাজে থাকলে হয়তো বলে দিতে পারতেন, কবে নাগাদ ফেরা হবে। আর ভাল লাগছেনা। রাণীর জন্য মন কেমন করছে।

চুপচাপ বসে আছি। রাণী, তুমি থাকলে বেশ হ'ত। সামনের চেয়ারটায় তুমি বসতে, কত গল্প করতাম—নদীর এত রূপ আগে দেখার সুযোগ হয় নি। তুমি নেই বলে ততটা ভাল লাগছেনা।

হ্যাঁ, কি বলছিলাম। পণ্ডিত মশাই—উনি আমার কাছে এসেছিলেন কিসের যেন চাঁদা চাইতে। গোল গাল মানুষ। সরল বলেই মনে হয়, বললেন "কিছু চাঁদা দিতে হবে"। বললাম "চাঁদা দেবার মত অবস্থা নেই।" ভদ্রলোক আর একটা কথাও বললেন না। ছাতাটা কোলে করে উঠে গেলেন। এত সহজে মুক্তি পাবো ভাবিনি—আবার ডাকলাম "আপনি সংস্কৃত কিরকম জানেন" ?

"আমি সাহিত্য রত্ন", উনি উত্তর দিলেন।

বললাম "তা নয়, পড়াতে পারবেন" ?

"আমার বাড়ীতে টোল ছিল, প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্র পড়তো।

"বেশ কাল থেকে আমায় পড়াবেন। তিরিশ টাকা বেতন দেবো"।

ভদ্রলোক হাসলেন। হাসির অর্থ বুঝলাম না, আজও বুঝিনি।

পণ্ডিত মশাইএর কাছে পড়া সুরু করলাম। ভদ্রলোক রসিক, খুব ব্যাকরণ প্রিয় নন। কালিদাসের কুমার সম্ভব নিয়ে পড়া আরম্ভ হ'ল। ঘণ্টা খানেক বাদে উনি উঠলেন। বোধহয় নীচে চলে গিয়েছিলেন, আবার ফিরে এলেন। "কাল রাতে আপনার জন্য একটা শ্লোক রচনা করেছি। সেটা লিখে নিন"।

উনি শ্লোকটা বললেন আমি লিখে নিলাম।

যবনৈর্ধষিতা স্ত্রিস্রো ভূতি বুদ্ধি ধৃতি স্ত্রিয়ঃ
সম্প্রতি নবোঢ়া কান্তা দুর্গতিঃ সহচারিণী।
ভবন্তমনুগচ্ছন্তম্ মাং রুষ্টা সৈবভামিনী॥
ভবন্মঙ্গলগেহেভ্যঃ ক্রন্দন্তীব বহিঃস্থিতা

যার ব্যাখ্যা দাঁড়ায় এই ঃ—ভূতি বুদ্ধি ধৃতি এই নামে আমার তিন স্ত্রী ছিল কিন্তু ভাগ্যবিপর্যয়ে যবনেরা তাদের ধর্ষণ করেছে। সে কারণ আজ আমি বিপত্নীক। আমি ব্রাহ্মণ, তাই আবার বিবাহ করেছি, এই নুতন পত্নীর নাম দুর্গতি। আজ আপনার মংগল গৃহে আমি প্রবেশ করেছি কিন্তু আমার দুর্গতি রূপিনী স্ত্রীর এখানে প্রবেশের অধিকার নেই। তাই আমার ওপর রুষ্টা হয়ে অভিমান বশতঃ ফটকের বাইরে বসে সে কাঁদছে।

বেশ ভালো লাগলো, বললাম "বেশ আমি আপনার দেখাশোনা করবো"।

যতদিন যায় পণ্ডিত মশায়ের পরিচয় পেলাম। ছোট খাট জমিদারী ছিল ওদের। নোয়াখালির লোক। বেশ কয়েক ঘর প্রজা। লোকে ওদের বংশ মর্য্যাদা চিরদিন দিয়েছে। পণ্ডিত ইংরাজি জানেন না মোটে, কিন্তু সংস্কৃতে যথেষ্ট পাণ্ডিত্য—টোল খুলে ছাত্র পড়াতেন। বেশ কয়েক ঘর যজমান ছিল—তাছাড়া জমিদারীর সামান্য অংশ—সবে মিলে ভালভাবে দিন কেটে যাচ্ছিল।

পণ্ডিত যৌবনে বিয়ে করতে চাননি—বাপ মার শত অনুরোধেও না। শেষে একদিন মামার বাড়ী বেড়াতে গিয়ে ফাঁদে পা দেন। মেয়েটী মামীর দূর সম্পর্কের বোন ঝি। তাকে দেখে পণ্ডিতের রস জাগে—মামীমার সাহায্যে বাপ মার অনুমতি নিয়ে বিয়ে হয়। বিয়ের পর জানতে পারেন এ তাঁর মারই কারসাজি।

নোয়াখালির কথা বলতে পণ্ডিতের চোখে জল আসে—ছোট বেলায়—ওখানকার নদীতে হৈ চৈ করেছেন, যৌবনে সুখে দুঃখে ভাগ নিয়েছেন, চল্লিশ বছর পর্য্যন্ত—সব সত্ত্বা দিয়ে দেশবাসীর মংগল কামনা করেছেন—একদিন হঠাৎ সেখান থেকে ভিখারীর মত বৌ-মেয়ের হাত ধরে বিদায় নিয়েছেন।

পণ্ডিতকে কেউ কিছু বলেনি, কিন্তু উনি ভয় পেয়েছেন—পাছে কেউ তাঁর বংশ মর্য্যাদায় হাত দেয়—বাপ পিতামহের প্রতিষ্ঠিত শালগ্রাম শিলা নিজের হাতে তুলে পুকুরের জলে

ফেলে এসেছেন। তবু কারুর অনিষ্ট তিনি চান না। বলেন, "নোয়াখালির লোক সুখে থাকুক"।

জিজ্ঞেস করি, "এখন দেশে ফিরে যান না কেন? আর তো কোন গোলমাল নেই"।

পণ্ডিত হাসেন —বড় করুণ হাসি—শুধু তাই দিয়েই তিনি প্রকাশ করেন—'আর ফেরা অসম্ভব—যে ঘর থেকে ঠাকুরকে বিদায় করেছি সেখানে আর ঢুকবো কোন মুখে?'

পণ্ডিতের মুখে অভাবের কথা কোনদিন শুনিনি। যখনি জিজ্ঞেস করি "পণ্ডিত মশাই কেমন আছেন"?

উত্তর দেন, "বেশ ভালই আছি"। সারা মুখে হাসি—এটা আমার বড় ভাল লাগে। মনে আছে, এক গরমের দিনে পণ্ডিত এসে বসেছেন। বললেন, "এক গ্লাস জল দেবেন, বড় তেষ্টা পেয়েছে"।

সত্যিই ভদ্রলোক ক্লান্ত, গল গল করে ঘাম ঝরছে। কি মনে হল, শুধু জল না দিয়ে—তার সংগে দুটো মিষ্টি এনে দিলাম—কাল বুঝি কোথা থেকে তত্ত্ব এসেছিল। পণ্ডিত যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না —বললেন, "সবই তাঁর লীলা," সন্দেশ মাথায় ঠেকিয়ে ভক্তি ভরে খেয়ে নেন। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "বাবুর একশো বছর পরমায়ু হোক"।

বললাম "এত কি দিলাম পণ্ডিত মশাই যে এত আশীর্বাদ"। "পরে বলবো, সে অনেক কথা—এখন পড়ার কাজ সুরু করা যাক"।

পড়া শেষ করে পণ্ডিত উঠে যাচ্ছিলেন। বললাম "কৈ কি কথা বলবেন বলছিলেন যে"।

পণ্ডিত হাসলেন। "ভোলেন নি দেখছি, তবে শুনুন বিশেষ কিছু নয়—কাল সন্ধ্যে বেলা বাড়ী ফিরছিলাম—হাজরা রোড থেকে একটা ভিখারী সংগ নিল। বললাম আমার কাছে পয়সা নেই বাবা। সে ছাড়ল না, এগিয়ে চলল। একঘেঁয়ে বকে যায়, তিনদিন সে নাকি খেতে পায়নি। আরও কত কি! কত করে বোঝালাম। আমি নিজে খেতে পাই না, তোমাকে কি দেবো। সে শুনলো না—বললে 'বাড়ীতে তোমার খাবার নেই—তাই থেকে দাওনা'! আর 'না' করতে পারলাম না—বললাম, 'চল'। বাড়ীতে মেয়ে ভাত বেড়ে রেখেছিল—উঠানে একটা পাতায়—তা' উজাড় করে দিলাম। ভিখিরী প্রাণ ভরে খেয়ে, জয় ধ্বনি করে চলে গেল।"

জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি খেলেন"? পণ্ডিত হাসলেন, "এই যে সকালে আপনার কাছে সন্দেশ—তাইতো আশীর্বাদ করছি—যদি আমার শরীরে এতটুকু ব্রাহ্মণত্ব থাকে আপনার দীর্ঘ পরমায়ু হোক"।

এত আন্তরিক শুভ কামনা—সারা গায়ে স্পন্দন অনুভব করলাম—চোখে জল এলো—ব্রাহ্মণকে ভাল করে খেয়ে যেতে বলার কথাও ভুলে গেলাম।

মাঝে পণ্ডিত কদিন আসেননি। বুঝলাম নিশ্চয় অসুখ করেছে তা না হলে উনি কামাই করেন না। সন্ধ্যের দিকে ঠিকানা খুঁজে ওঁর বাসা বের করলাম—সে একটা বস্তির মধ্যে চার চৌকো টিনের বাক্স—মেটে দালান—ঘাসের উঠান—সব রকমের অব্যবস্থা—জোর করে ঘর বলতে হয়।

পণ্ডিত বাইরের দালানেই বসেছিলেন—আমাকে অপ্রত্যাশিত ভাবে সেখানে দেখে কি করবেন ভেবে পান না। তাঁকে অসুবিধায় না ফেলে দালানেই বসে পড়লাম। "বড় বাতের যন্ত্রনায় ভুগছি, তাই এ'কদিন যেতে পারিনি—কাল থেকে যাব মনে করছিলাম"।

বললাম "এখানে আপনার বড় অসুবিধা হয় না" ?

পণ্ডিত হাসলেন, অসুবিধা মনে করলেই অসুবিধা—দেশে একরকম ছিলাম—এখানে আরেক রকম—দেশে এই রকম ঘরে আমার গরু থাকতো—এখানে আমি থাক্‌ছি…এই আর কি" ?

একটী মেয়ে বাতাসা আর জল নিয়ে এলো। এ হলো আতিথেয়তার রীতি। না করতে পারলামনা, খেয়ে নিলাম। পণ্ডিত দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, মেয়েকে দেখিয়ে বললেন, "ওর

মা বড় সুখী মানুষ ছিল। যেদিন এবাড়ী দেখলো সেইদিন ও বলেছিল 'এ বাড়ী থেকে আর বোধহয় অন্য বাড়ী যেতে হবেনা'। সতীর কথা মিথ্যে হয় নি—একদিনের কলেরায় মারা গেল"।

কি বলা উচিত ভেবে পেলাম না।

পণ্ডিত আরোও গম্ভীর গলায় বললেন, "এত লোকের ঠিকুজি দেখে এত কথা বলি—কিন্তু ও যে এ সময় মারা যাবে তা কোনদিন কল্পনাও করিনি"।

বেহালার কাছে পুরানো আমলের বাগানটায়—মালীরাই চাষবাস করে।

মাসে একবার ওদিকে যখন বেড়াতে যাই ফলটা মূলটা তুলে আনি। দু'একজনের থাকার মত পাকা ঘরও আছে, অনেক দিন ব্যবহার করা হয় নি। ভাবলাম পণ্ডিতের উপকার করা হবে—তাই তাদের পাঠিয়ে দিলাম বেহালায়।

পণ্ডিত দু'একবার আপত্তি করেছিলেন, "দেখুন এতে করে যদি আপনাদের মুস্কিল হয়—তাহলে—"

আমি বাধা দিয়ে বলেছি, "সে ভাবনা আপনাকে করতে হবেনা—দেখুন জায়গাটাকে থাকার মত করা যায় কিনা।"

তারপর শিলং চলে গিয়েছিলাম বেড়াতে। ফিরতে প্রায় মাস-খানেক দেরী হল। ফিরে দেখি পণ্ডিত ঠিক আগের মতই

আছেন—পরণে ধুতি, পায় চটী, গলায় পৈতে। জিজ্ঞেস করলাম, "কি পণ্ডিত মশাই, কেমন আছেন ?"

পণ্ডিতের এক উত্তর, "বেশ ভালই তো।"

একদিন আমায় বললেন, "একটা কথা বলবো ?"

বললাম, "কি বলুন ?"

পণ্ডিত ইতস্ততঃ করেন, "কিছু টাকা ধার দেবেন ?"

হাসলাম, "কত ?"

"একশো টাকা—বোশেখ মাসে ফেরৎ দেবো।"

"বেশতো, তা না হয় দেওয়া যাবে, কি করবেন বলুন ?"

পণ্ডিত অসম্মতি জানান, "তা বলবো না—পরে টের পাবেন"

বৈশাখ কি জ্যৈষ্ঠ মাসে পণ্ডিত সত্যিই একশো টাকা ফেরৎ দেন। ধার শোধ করেন। চোখে মুখে সাফল্যের হাসি।

জিজ্ঞেস করলাম, "এ কদিন কি করলেন টাকা নিয়ে ?"

পণ্ডিত কোন জবাব না দিয়ে—ঝুলি থেকে দুটো পুতুল বার করে সামনে ধরলেন, "কেমন লাগে" ?

গণেশ ও লক্ষ্মীর প্রতিকৃতি—মন্দ লাগল না—বললাম "বেশ ভালই তো"।

পণ্ডিত গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়লেন, "পুতুলের ব্যবসা করছি।"

আশ্চর্য্য হলাম, "সে কি ?"

"আজ্ঞে আপনি যখন পাহাড়ে বেড়াতে গেলেন, একদিন আমারই মত এক :উদ্বাস্তু মেয়ের সঙ্গে দেখা—জাতে কুমোর।

মেয়েটী আমার মেয়ের কাছে এসে এমনি একটা পুতুল দিয়ে কিছু পয়সা চাইছিল।

আমি বললাম, "তুমি পুতুল বিক্রী করোনা কেন?"

মেয়েটী বললে, "মাটি কেনার পয়সা নেই। যা দু চার পয়সা পাই তাই দিয়ে এই পুতুল বানাই আর আপনাদের কাছে ভিক্ষে চাই।"

পণ্ডিত হলেও মাথায় বুদ্ধি আছে তো! বললাম, "আমি যদি মাটী দিই তুমি পুতুল বানাবে ?"

সে সম্মতি জানাল। তারপর আপনার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে মাটী কিনলাম, রঙ কিনলাম। মেয়েটীর সাতকুলে কেউ নেই। তাকে এনে বাড়ীতে রাখলাম—আশ্চর্য্য কাণ্ড আমার মেয়েগুলোও ওর সাথে জুটে গেল—মেয়েটী তিন চার রকমের ছাঁচ বানায়—ওরা সবাই মিলে পুতুল তৈরী করে—এই ক'মাসে —প্রায় আড়াই শ' টাকার পুতুল তৈরী হল—কালীঘাটের কতকগুলো দোকানের সংগে কথা বলে পাইকিরি দরে বিক্রী করলাম। দু'শ পচিশ টাকা পেয়েছি—এই আপনার এক শ' টাকা—বাকী একশ'পঁচিশ টাকা দিয়ে আবার মাটি কিনেছি।

সবটাই যেন গল্প বলে মনে হচ্ছিল—আজকের দিনে এও কি সম্ভব। পণ্ডিত মশাই নিজে থেকেই বল্‌লেন, "আস্‌বেন একদিন সময় করে দেখবেন কেমন কাজ হচ্ছে।"

বাসনাদি কথা শুনে লাফিয়ে ওঠেন যেন এমনি কিছুর আশা তিনি অনেক দিন থেকে করেছিলেন।

সেই দিনই বেহালায় যাওয়া হল। বাগান আগের চেয়ে নোংরা হয়েছে সন্দেহ নেই—একতাল মাটি বাগানের কোণে জড় করা রয়েছে—পাশে বাঁশের মাচা, তারই নীচে পুতুলের কারখানা, সামান্য কয়েকটা ছাঁচ তাইতে ফেলে মাটিকে রূপ দেওয়া হচ্ছে —দু'দিন শুকিয়ে তারপর রং চড়ানো হবে।

বাসনাদি আনন্দে ছেলেমানুষের মত মাটি নিয়ে খেলা করতে বসে গেলেন। "আমিও পুতুল করবো, আমাকে শিখিয়ে দেবে ?" মেয়েরা হাসে, ঠাট্টা ভেবে নিজেদের মধ্যে কানাকানি করে।

পণ্ডিত বলেন "এ ভাবে যদি চলে ঈশ্বরের কৃপায় আর আমাদের অভাব হবেনা—এ চারটে প্রাণীর বেশ চলে যাবে।"

বাসনাদি বাধা দিয়ে বললেন, "এ হলেই তো হবেনা পণ্ডিত মশাই।"

"কেন মা ?"

"আরোও কত অনাথ মেয়ে এই ভাবে পড়ে আছে—তাদের কে দেখবে ?"

পণ্ডিত ম্লান হাসলেন, "আমি আর তার কি করতে পারি মা—একদিন ছিল যখন অনেককেই সাহায্য করেছি কিন্তু আজ ?"...

বাসনাদি সজল কণ্ঠে বললেন, "পণ্ডিত মশাই, আজও পারবেন কারণ লোকের দুঃখ যে বোঝে সেই মানুষকে সাহায্য করতে পারে, তার সামর্থ্য না থাকলেও।"

কথাটা এত সত্যি যে পণ্ডিত অস্বীকার করতে পারলেন না—"বল মা এ বুড়োকে দিয়ে যদি কোন কাজ সম্ভব হয় সে করবে।"

বাসনাদি হাসলেন, "সে আমি জানতাম—আর কিছু ভাবতে হবেনা—আমার পাঁচটী মেয়ে আছে এমনই দুঃখী তারা—তাদেরও এই কাজে লাগিয়ে দেব—বেশী মাটি, বেশী রং

সব দেবো—অনেক বেশী পুতুল হবে—বেশী বিক্রী হবে—সবাই মিলে থাকতে পারবে"।

পণ্ডিত কথা বলতে পারেন না। গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বল্লেন "বাবু, মা আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা"।

গীতা পড়ছিলাম। পণ্ডিত ব্যাখ্যা করে যাচ্ছেন কর্মযোগ জ্ঞানযোগ—হিন্দু ধর্মের সমস্ত সার কথা। পণ্ডিতের চোখে জল ভরে আসে—মনে ভাবলাম ধর্মভীরু লোকের পক্ষে স্বাভাবিক—একসময় হঠাৎ থেমে গেলেন—

পণ্ডিত হতাশ ভাবে বলেন, "কি হবে পড়ে" ?

ঠিক বুঝতে পারলামনা, "কেন" ?

"এতো শুধু মুখে আওড়ে যাচ্ছি—সত্যিকারের ধর্মটা ক'জন বুঝেছে বলতে পারেন—আমরা কি ব্রাহ্মণ ?—ব্রাহ্মণত্বের ক' ফোঁটা রক্ত আমাদের মধ্যে আছে—যা ছিল তাও আমরা নষ্ট করেছি"।

বললাম "আবার ফিরবে, ভয় কি" ?

পণ্ডিত আরও গম্ভীর হয়ে যান, "আমিও একদিন ঐ কথা ভাবতাম, কিন্তু আজ আর সে আশা করিনা, কারণ স্বপ্ন দেখার বয়স চলে গেছে, যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও হ'য়েছে"।

কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না—পণ্ডিত কিন্তু হাসেন না, "আচ্ছা বাবু, আপনি তো অনেক পড়াশুনা করেছেন—সত্যি করে বলুনতো—আর কোন আশা আছে—আবার কি

আমরা মানুষ হতে পারবো"? কত দুঃখে যে পণ্ডিত এ কথাগুলো বলেন বুঝতে পারি।

সে দিন মিসেস্ ঘোষের বাড়ী চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল—ওর মেয়ের জন্মদিন। প্রতিবারেই এ দিন হৈ চৈ হয়—এবারও তার ব্যতিক্রম হয় নি। ঘোষকন্যা আমার তথাকথিত বান্ধবী—আমাকে দেখেই কৃত্রিম আনন্দের ভাণে আপ্যায়ন করে, যেন এত খুসী আর কারও আসায় সে হয় নি। অবশ্য এ ভুল ভাংগতে দেরী হয় না—যখন দেখি, সকলের বেলাতেই ঐ একই আনন্দের তুফান! সভা জমে উঠলো।

ঘোষকন্যা মীরা আমার দিকে নজর দেয়, "আপনি আসবেন ভাবিনি"।

"কেন প্রতিবারই তো আসি", আমি অনুযোগ করি।

"এবারের কথা আলাদা—কারণ এবার তো দেশনেতা হবার চেষ্টা করছেন কি না"।

শুধু হাসলাম, এটা বোধ হয় মীরার পছন্দ হয় না—নিজে থেকেই বলে, "বাস্তুহারা কত জড়ো করলেন"?

"বেশী আর কি", এ আলোচনা আমি চালাতে চাই না।

মীরার মা বোধ হয় কথাগুলো শুনেছিলেন, বললেন, "যাই বল কলকাতাটা ওরা নষ্ট করে দেবে—যা রোগের বহর আর কাউকে টেঁকতে দেবে না"।

আমার উত্তরের অবসর না দিয়ে কে এক সভাসদ্ অভিমত প্রকাশ করে—, "I wish I were in Europe" !

খুব নরম করে বলতে গিয়েছিলাম, "দেখুন আপনারা বাংগালী হয়ে যদি বাংলার এই দুঃখের দিনে সহানুভূতি—"

শেষ হতে পেলনা—মীরা বললে, "এইতেই চলবে, অদূর ভবিষ্যতে আপনার নেতা হওয়া কেউ আটকাতে পারে না"।

মিস্টার ঘোষ এতক্ষণে কথা বলেন, "কেন সহানুভূতি থাকবে, যদি সত্যি কথা বলতে হয়, তা অপ্রিয় শোনাবে—যে সব মেয়ে ওধার থেকে আসছে—খেতে না পেয়ে তারা দুমুঠো ভাতের জন্য দেহ বিক্রী করবে—আর পুরুষগুলো চোর ডাকাত হবে"।

অসহ্য লাগল, বললাম, "সব জিনিসেরই যদি খারাপ দিকটা দেখেন—"

উনি ফোঁস করে ওঠেন, "এর আর ভালো দিক কিছু আছে বলে তো মনে হয় না—What a tragedy—সতীত্ব রক্ষার জন্যে এক দেশ থেকে সব কিছু ফেলে এসে পেটের দায়ে সেই সতীত্ব খোয়াতে হবে"।

বুঝলাম এদের বোঝাবার চেষ্টা করে ফল হবে না। বেশী কথা না বলে—অন্য যায়গায় কাজের অছিলায় তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। গাড়ীতে চেপে মনে হলো কোথায় যাই—কেন জানিনা বেহালার দিকে চললাম। মনটা বেশ খারাপ

হয়ে গিয়েছিল—ভাবছিলাম মানুষ এত অবুঝ হয় কি করে ?

পণ্ডিত বাড়ী ছিলেন না, বেরিয়েছেন। ভিতরে গেলাম—পুতুল করা এখনো শেষ হয় নি—বাসনাদি' আরো পাঁচটি মেয়ে পাঠিয়েছেন—তারাও এখানে থাকে, পুতুল তৈরী করে। দেখলাম কয়েকশো' মাটির পুতুল তৈরী হয়ে পড়ে রয়েছে—বেশ লাগলো—অতগুলি মেয়ের সমবেত প্রচেষ্টা—সকলেই সর্বহারা—কিন্তু জীবন ধারণের পথ তারা পেয়েছে—এমনি করেই তো জীবনীশক্তি বাড়বে!

পণ্ডিতের মেয়ে রেকাবে করে—মিষ্টি আর জল নিয়ে আসে। আজ বাধা দিলাম, "এখুনি নেমন্তন্ন বাড়ী থেকে আসছি—এখন আর খাবো না"।

মেয়েটি ইতস্ততঃ করে, "আজ আমার বোনের জন্মদিন" আর না করতে পারলাম না, কষ্ট করেও খেয়ে নিলাম। মনে পড়ে গেল—মীরার জন্যে এক ঠোঙায় নানা রকমের লজেন্স, চকোলেট এনেছিলাম—কিন্তু হঠাৎ চলে আসায় দেওয়া হয় নি—গাড়ীতে পড়ে আছে। সেগুলো এনে এদের মধ্যে বিলিয়ে দিলাম। সকলের মুখে সংকোচ, লজ্জা, অথচ আনন্দ, সত্যি বড় ভালো লাগলো—সার্থক আজ আমার চকোলেট কেনা। মনে যা গ্লানি জমা হয়েছিল মুছে গেল—গাড়ীতে উঠে বাড়ী চললাম।

কালীঘাটের রাস্তায় বাসনাদি' ছোট দোকান খুলে দিয়েছেন—শুধু পুতুল বিক্রি হয়—সামানে খোলার ঘর ভর্তি পুতুলের

সারি—। মেয়েদের কাছ থেকে পাইকিরি দরে এনে এখানে খুচরো বিক্রি হয়। পণ্ডিত সারা দুপুর কাজ দেখেন—একটি মেয়ে তাকে সাহায্য করে, এ থেকে দুটি মেয়ের খরচা চলে যায়।

বাসনাদি' মাঝে মাঝে খবর নিয়ে যান—"কি পণ্ডিত মশাই কোন অসুবিধে নেই তো?"

পণ্ডিত হাসেন—"মা অন্নপূর্ণা যার প্রতি প্রসন্না—তার আবার অসুবিধা কি?"

আমিও মাঝে মাঝে যাই, জিগ্‌গেস করি, "কেমন বিক্রী হলো"?

"ঠাকুর-দেবতা খুব বেশী চলে না, সবাই নেতাদের চেহারা চায়—এবার থেকে তাই গড়াচ্ছি, এই দেখুন নেতাজী।"

দেখলাম, তবে চেহারাটা ঠিক হয় নি, কাছাকাছি গেছে, অবশ্য চাহিদা ওরই বেশী, পণ্ডিত বলেন, "এত দিনে ধরতে পেরেছি—কোন্ সময় কোন্ পুতুলের দরকার—নতুন খাতার সময় গণেশ, পূজোর সময় লক্ষ্মী, তা না হলে দেশনেতা।" পণ্ডিতের মাথায় ব্যবসা-বুদ্ধি খেলছে—হাসি পেলো, মাঝে মাঝে খদ্দের আসে—"এ গণেশের কত দাম?"

"বারো আনা।"

"ওঃ বাবা, এ-তো—ওইতো ওখানে বলছে দশ আনা।"

"তবে ওখানেই যাও না," ব্যাবসায়ী পণ্ডিত উত্তর দেন।

"আবার কে যায়—দাও তোমারটাই দাও—"

পণ্ডিত হাসেন, "হেঁ হেঁ অন্য কোথাও চোদ্দ আনার কমে পাবেন না বাবু এই বাজারে, কেনা দামেই দিলাম।" পণ্ডিত টাকা বাজিয়ে নেন, গুণে গুণে পয়সা ফেরৎ দেন। পাকা দোকানী!

ঠাকুর এসে ডেকে গেল—খাবার দিয়েছে। ডেক থেকে উঠে সেলুনে এসে বসলাম—তিনটে টেবিল পাতা রয়েছে—বারো জনের খাবার ব্যবস্থা—একা বসে আছি। জাহাজ চলে না বলেই বোধহয় আলোগুলো নিস্তেজ। ঠাকুর খাবার দিয়ে গেল। কয়েকটা রুটী—না বলে দিলে বোঝা যায় না, আর একটা তরকারী—সহজেই মশলার প্রাচুর্য্য চোখে পড়ে। কলকাতা হলে এ জিনিষ কখনও মুখে দিতাম না—কিন্তু বিদেশে জাহাজের উপর বন্দী অবস্থায় এর চাইতে বেশী আর কি আশা করা যায়। শুধু দুঃখ এই, সংগে আর একজন কেউ নেই—যে দেখে, কত কষ্ট করে রয়েছি। জানি কলকাতা ফিরলে এ কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। রাণী, তুমি থাকলে এ খাবার কিছুতেই খেতে দিতে না—আমায় খেতে হলে তুমি কষ্ট পেতে। তোমার কথা ছেড়ে দাও—বরিশাল থেকে চাঁদপুরে আসতে—পুলিশের হাবিলদারও আমার খাওয়া দেখে দুঃখ প্রকাশ না করে পারেনি,

"আপনি এ কি করে খাচ্ছেন ?"

বলেছিলাম "কি করবো, সংগে নিজের লোক তো আনিনি, তাই উদ্বাস্তুদের আনতে যে ঠাকুর এসেছে তারা যা রেঁধে দেয় তাই খাই।" মনে মনে বোধ হয় গর্ব্ব অনুভব করেছিলাম।

হাবিলদার সেই থেকে আমাকে সুনজরে দেখতে থাকে—পথে নৌকা থেকে ডাব কেনারও সুযোগ দেয়। কথায় কথায় লোকটার সংগে আলাপ হয়ে গেল।

"পাটনায় আমার বাড়ী," হাবিলদার বলে।

"তাহলে আপনি এখানে কেন ?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"সে অনেক কথা—আপনার বাড়ী—কলকাতায়—অমুক জায়গায় না ?"

"হাঁ, কি করে জানলেন !"

"আপনার লোকেরা বলাবলি করছিল। আমারও ওর কাছাকাছি বাড়ী—ফোর্ড কোম্পানীর গ্যারেজের কাছে।"

"কোন বাড়ীটা বলুন তো।"

"গোলাপী রং এর দোতালা বাড়ী—নীচে একটা ট্যাক্সির আড্ডা আছে।"

মনে পড়ে গেল, "ওখানে কি আমিনারা থাকতো।"

হাবিলদার সমর্থন করে, "হাঁ ঠিক বলেছেন বাবুজী, আমিনা আমার দিদি।"

"তাই নাকি ছোট বেলায় ওদের সংগে কত খেলাকরেছি।"

মনে পড়ছে—তখন বছর আটের ছেলে, ড্রাইভার, চাকরদের সংগে সামনের পার্কে খেলতে যেতাম—কত ছোটছোট ছেলে মেয়েরা আসত—আমিনা আসতো তার ছোট ভাইকে নিয়ে। খেলাধূলা সেরে সন্ধ্যেবেলা যে যার বাড়ী চলে যেতাম। মনে পড়ছে—একদিন সন্ধ্যেবেলা আমিনাদের বাড়ীর সামনে

দিয়ে ফিরছিলাম—পার্কের কাছাকাছি বেশ অন্ধকার—কোটের পকেটে একগাদা মার্বেল। হঠাৎ দুটো পাঞ্জাবী ছেলে এসে আমায় চেপে ধরে—তারা বয়সে আমার চেয়ে বড়—শরীরে তো বটেই। বলে, "তোমার পকেটে যে গুলি আছে—দিয়ে দাও।"

জিগ্‌গেস করলাম "কেন দেবো ?"

আমার গালে এক চড় বসিয়ে দিলে, "দিয়ে দাও বলছি।" কেঁদে ফেললাম—কাছে পিঠে জনপ্রাণী নেই—গলা শুকিয়ে গেছে, স্বর বেরুচ্ছে না। অগত্যা পকেট থেকে একটি একটি করে গুলি বার করতে লাগলাম-কত কষ্ট করে এগুলো জমিয়েছি, কতজনকে হারিয়ে, কত দোকান থেকে কিনে। এমন সময় একজন দৌড়ে এসে সেই পাঞ্জাবী ছেলে দুটোকে চোরের মার মারে—তারা ছুটে পালায়। আমি কেমন যেন থতমত খেয়ে গিয়েছিলাম। চমক ভাংগলে দেখলাম—আমিনাও এসেছে। বুঝলাম দূর থেকে আমার দুরবস্থা দেখে আমিনা তার লোক ডেকে এনেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন "খোকা তোমার লাগেনি তো ?"

কেন জানিনা ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেললাম।

সেইদিন থেকে আমিনার সংগে খুব ভাব হয়ে গেল—অত যত্নে সঞ্চিত গুলি ভাগ করে অর্ধেক গুলো ওকে দিয়ে দিলাম। এভাবে অনেক দিন চলে। তারপর একদিন আমিনা বড় হয়ে পর্দার অন্তরালে চলে গেল—আমাদের মেলামেশাও বন্ধ হয়ে যায়।

হাবিলদারের কথায় চমক ভাংগে, "ছেচল্লিশ সালে কলকাতায় যখন দাংগা হয়, মনে আছে বাবুজী ?"

"মনে নেই কি নৃশংস কাণ্ড—!

"সেই সময় ঐ বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়", হাবিলদার দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

কথা শুনেই চোখের সামনে ছবি ভেসে উঠে। সলিল এসে বলছে, "বাঁচাতে পারলাম না, অল্প দেরী হয়ে গেল।"

"ভেতরে লোক ছিল না তো ?"

"না, আমরা শ্যামবাজার থেকে কয়েকটা ফ্যামিলি উদ্ধার করে আনতে গিয়েছিলাম, এসে শুনলাম—ফোর্ড কোম্পানীর পাশের বাড়ীতে পাঞ্জাবীরা আগুণ লাগিয়েছে। অবশ্য বিশেষ কিছু হয়নি। দমকল এসেই আগুন নিভিয়ে দিয়েছে।"

তখনই আমিনাদের কথা মনে হয়েছিল, কিন্তু বিশেষ খোঁজ পাই নি। হাবিলদার বললে, "আমার আসবার আগেই পাড়ার কয়েকটি ছেলে বাড়ীর সবাইকে বার করে নিয়ে যায়—আসবাব থেকে জিনিষপত্র সব কিছু—কারো কোন ক্ষতি হয় নি। অথচ কি আশ্চর্য্য জানেন—যে বাড়ীতে এসে পুলিসের জিম্মায় আমরা রইলাম—সেইখানে রাঁধতে গিয়ে আমার বোন পুড়ে যায়—কোমর থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত।"

"কি সর্ব্বনাশ—"

"শম্ভুনাথ হাসপাতালে তাকে ভর্তি করে দিলাম—"

সত্যি বড় কষ্ট হ'ল, "এখন তিনি কেমন আছেন ?"

"ভাল হয়ে গিয়েছিল,—তবে মাস দুই আগে খবর পেয়েছি আবার কতগুলো ঘা হয়েছে, তারপর আর চিঠি পাইনি, কি জানি কেমন আছে। কলকাতাতেও তো শুনছি—"

"ভয় নেই এবার কলকাতায় কিছু হয় নি।"

"কি জানি, না হলেই ভালো," হাবিলদার অন্যমনস্ক হয়ে যায়, "একি হলো বাবুজী—আমি ছাড়া আমার বাড়ীর সবাই হিন্দুস্থানে মিলিটারিতে আছে—এখানে চাকরি নিয়ে, চলে এসেছি—বাকি সবাই আছে পাটনায়, নয় কলকাতায়—অথচ একটা খরব দিতেও পারিনা, নিতেও পারি না।"

সরল মানুষের প্রাণের কথা—তাকে কি বোঝবো, বললাম, "আমার বিশ্বাস—সব ঠিক হয়ে যাবে—আর কয়েক বছর কেটে যাক্—মানুষ নিজের ভুল বুঝতে পারবে"।

"তাই যেন হয় বাবুজী, এভাবে মানুষ বাঁচবে না—হিন্দুও না মুসলমানও না," একটু থেমে হাবিলদার সহজ ভাবে বলে—"আপনি কবে কলকাতা ফিরবেন ?"

"বোধ হয় দিন দশেক বাদে।"

হাবিলদার মিনতি করে বলে, "একটা খবর আমায় পাঠাবেন বাবুজী।"

"কি খবর বলুন"

সে ইতস্ততঃ করে, "আমার বোনের খবর—আল্লা জানেন—সে আমার বড় আদরের, এতদিন খরব না পেয়ে পাগল হয়ে গেছি—আপনি দয়া করে যদি টেলিগ্রামে কি চিঠিতে জানিয়ে

দেন, সে ভালো আছে—আমি চিরকাল আপনার গোলাম হয়ে থাকবো।"

"একথা আপনি কি বলছেন, আমায় ঠিকানা দিয়ে দিন—আমি নিশ্চয় তাদের খবর নিয়ে আপনাকে জানিয়ে দেবো।"

ঠিকানা লিখতে গিয়ে হাবিলদারের চোখ সজল হয়ে যায়, "কি জানি, সে কেমন আছে।" বিহারী মুসলমানের তাগড়া চেহারার মধ্যে যে এতখানি কোমল এক দাদার প্রাণ লুকিয়ে রয়েছে—কে বিশ্বাস করবে ?

মনে পড়ছে সেই দিনই ইন্‌সপেক্টারকে জিগগেস করেছিলাম, "আচ্ছা হাবিলদার লোক কি রকম ?"

সে সোচ্ছ্বাসে প্রশংসা করে বলেছিল, "আশ্চর্য লোক মশাই এমনিতে বিশ্বাস করতে পারবেন না।"

"কি রকম" আমি প্রশ্ন করি—

"সারাদিন হাবিলদারী কাজ করে—রাত্রিবেলা এক হিন্দু পরিবার পাহারা দেয়। সে পরিবারের ছেলেরা নাবালক, বাপ মরে গেছে। হাবিলদার সেই বাড়ীর নীচের তলা ভাড়া নিয়ে থাকে—সব সময় দেখাশুনা করে—ছুটি পেতে দেরী হলে আনমনা হয়ে যায়—ওর বৌ মেয়ে সবাই—যেন একটা পরিবারের মধ্যে বাস করে।"

কথাগুলো শুনতে বড় ভালো লাগলো। চাঁদপুরে নেমেই বাসনাদিকে তার করলাম—এদের বাড়ীর খবর নিয়ে জানাতে—এখনও তার জবাব পাই নি।

কেবিনটা বড় ছোট মনে হচ্ছে—কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে—চার'দিক আঁটা—বাইরের হাওয়া ঢোকার পথ নেই। দু'খানা পাখা ঘুরে যাচ্ছে—অবিশ্রান্ত ভাবে—একই হাওয়া পাক খাচ্ছে ছোট্ট কামরার মধ্যে। উঠে বসলাম, বোধহয় জল তেষ্টা পেয়েছে। হাতড়ে সুইচ টিপে আলো জ্বাললাম—তবু ভালো লাগে—দম বন্ধ ভাবটা কমে আসে। অথচ এমনি কামরায় কত লোক সারাজীবন কাটিয়ে দিচ্ছে। আমার খালি বাড়ীর কথা মনে পড়ে, কৈ তাদের তো এমন হয় না—এই তো সেদিন জাহাজের ক্যাপ্টেনের সংগে কথা হচ্ছিল—

"যাই বল, তোমাদের দেশের লোকেরা বড্ড হোমসিক—নিজের বাড়ী ছেড়ে কোথাও গিয়ে দু'দিন থাকতে পারে না।"

আমি প্রতিবাদ করেছিলাম, "একথা ঠিক নয়, কত লোক তো আছে"—

সাহেব বাধা দিলে, "দেখো, আমি বিলেতের লোক—সেইখানে লেখাপড়া শিখেছি—বাবা-মা অষ্ট্রেলিয়ায় ব্যবসা করেন—এখন এই ভারতে চাকরি করছি—কৈ আমরা তো বাড়ী বাড়ী করিনা।"

বললাম, "তোমাদের কথা আলাদা।"

"কেন?" সাহেব পাল্টা প্রশ্ন করে।

"তোমার বয়স কত?"

"ত্রিশ হবে—"

"অথচ বিয়ে করনি—এই বয়সে আমাদের—স্ত্রী, পুত্র, সংসার।"

সাহেব হাসেন, "সেটা ভাল কিনা জানিনা, কিন্তু আমাদের-ওতো অন্য টান আছে।"

"কি রকম," কৌতুহল প্রকাশ করি।

"ধর প্রেম, সে আকর্ষনটাও তো কম নয়?"

এবার আমার হাসার পালা—"তোমাদের জীবনে প্রেম? এর কোন দাম আছে নাকি?"

"কি ভাবো তোমরা", সাহেব ম্লান হাসে, "আমি পেসিলাকে ভালবেসেছিলাম—আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে—এখনও বাসি—

হয়তো ভবিষ্যতেও বাসবো।" কথাগুলো বড় জোর দিয়ে সে বলেছিল তাই ভাল লাগেনি, কিন্তু সে থামলো না—বর্ণনা করে গেল তার প্রেম কাহিনী।

পেসিলা মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। তার সংগে আলাপ হয়েছিল এক হোটেলে—ছুটীর সময় বেড়াতে গিয়েছিলাম। পেসিলা তার মেয়ে বন্ধু জিলের সংগে সেখানে এসেছিল। প্রথম আলাপ থেকেই পেসিলাকে আমার ভালো লাগে—কারণ সে অনেক কিছু চিন্তা করতো—সহজ ভাবে জীবনকে সে নিতে পারেনি। কিন্তু জিল ছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত ধরণের—সে পেসিলার চেয়ে সুন্দরী—কিন্তু জলের মতই তরল এবং লঘু। প্রথম আলাপেই জিল আমায় বলেছিল, "তুমি লোকটাকে আমার ভাল লাগে—শুধু এই জন্যে যে তুমি মেয়েদের মনের কথাটা বেশ বুঝে নিতে পার।"

মনে মনে এ প্রশংসায় খুসী নাহয়ে পারিনি—বললাম, "তুমি কি করে বুঝলে ?" জিল হাসলো "তোমার মুখ দেখে। তুমি বেশ বুঝতে পারছো যে আমি এখন টেনিস খেলতে চাই এবং তুমি তার জন্য প্রস্তুত হয়েই রয়েছো, ঠিক কিনা বল ?"

আমি হেসে ফেললাম এবং তৈরী হয়ে নিয়ে খেলতে চললাম। পেসিলাও আমাদের সংগে এলো বটে, কিন্তু ও খেলে না—বসে বসে দেখতে লাগলো আমাদের খেলা।

কতদিন রাত্রিবেলা আমরা তিনজন বসে খেলা করতাম—কত রকমের খেলা পোকার, জ্যাকপট—কত কি—মনে আছে

জিল একদিন বলেছিল "আমার বন্ধুটি এসব খেলাও ভালবাসেনা —নেহাৎ তুমি আছ বলেই খেলা-ধূলা করছে।" কথাটা আমার ভাল লাগে কারণ পেসিলাকে আমি মনে মনে ভাল-বেসেছিলাম তাই কোন বিষয়ে তার আমাকে ভাল লাগে শুনলেই আনন্দ হত।

সাহের কি যেন খানিকটা ভেবে বলে, "পেসিলার মনের কথা বুঝতে পারলাম কয়েক দিনের মধ্যেই। হঠাৎ আমার পা মচকে গেল, তাই আর বেশী হাঁটাহাঁটি করতে পারতাম না। চেয়ারে বসে থাকতে হত। হোটেলের সবাই যখন হৈ চৈ নিয়ে ব্যস্ত আমি তখন চুপচাপ বসে থাকি। এই সময় সে প্রায়ই আসতো, আমার সংগে গল্প করতো, নয়তো বই পড়ে শোনাতো। আমার জীবনে এত সুখের দিন বোধহয় আর কখনও আসেনি। কোনদিন কথা যেন ফুরোতনা। মনে আছে একদিন সন্ধ্যেবেলা —বড় পার্টি ছিল। সবাই চলে যাচ্ছে—আমরা বই পড়ছিলাম, পেসিলাকে বললাম "যাও এবার তৈরী হয়ে নাও।" সে কোন উত্তর দিলে না। শুধু একবার সজল চোখে চেয়ে বলেছিল, "আমার না গেলেই কি নয়?" সামান্য ক'টা কথা কিন্তু ঐগুলি সেদিন তার মনের কথা প্রকাশ করেছিল। জিল এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল। মনটা কেমন ছলছলিয়ে ছিল—চুপচাপ বসে আবোল তাবোল ভাবছিলাম—বেশীর ভাগই পেসিলার কথা— পেসিলা গরীব ঘরের মেয়ে—বাপ মা নেই—কাকার কাছে মানুষ—আহা ছেলেবেলাটা বড় কষ্টে কেটেছে বেচারীর—

কিন্তু এখন সে স্বাধীন—কোন ব্যবসায়ী আফিসে চাকরী করে। ছুটীতে বন্ধু জিলের সংগে বেড়াতে এসেছে। চেয়ারেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানিনা—কার হাতের কোমল স্পর্শে চমকে উঠলাম—আমার মাথার কাছে পেসিলা দাঁড়িয়ে—তার মুখটা ঝুকে পড়েছে আমার মুখের উপর। আনন্দের উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি এখানে ?"

সে ম্লান হাসলে, "আর নাচতে ভাল লাগছে না।"

এর পর থেকে আমাদের দুজনের মনেই দুজনের জন্য সম্পূর্ণ আস্থা এসেছিল, জীবনের অনেক গোপন কথাই আমরা আলোচনা করেছিলাম। আস্তে আস্তে সেরে উঠলাম—পেসিলাকে নিয়ে বাইরে ঘুরতে যেতাম। এতদিন জিল আমার দিকে খুব বেশী ঘেঁসত না কিন্তু এখন আবার দলে যোগ দিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সঙ্গে নিতে হ'ত পাছে কিছু মনে করে।

এক সপ্তাহ পরে—রাতের খাওয়ার পর বারাণ্ডায় বসে আমি আর পেসিলা গল্প করছিলাম—আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের ছবি আঁকছিলাম—সবকিছুই পাকাপাকি শুধু মুস্কিল আমার চাকরি নিয়ে—একটা ভালো চাকরি না পেলে—কোন কিছুতেই সুখ নেই, বিয়ে করাও অসম্ভব। অত্যন্ত নীচু গলায় আমরা কথা বলছিলাম, স্বপ্নময়ী রাত—পেসিলার সারা দেহে প্রেমের হিল্লোল—খুব নিবিড় আলিংগনে আমরা দুজন বদ্ধ হলাম—অতি ধীরে বলেছিলাম "সি, তুমি আমার জীবনকে প্রস্ফুটীত করেছ।" ঠিক সেই সময় কে যেন আমাদের পাশ দিয়ে চলে

গেল—অন্ধকারেও চিনতে পারলাম সে জিল—কেমন যেন অচেনা নূতন দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়েছিল।

সেই দিনই রাত্রিবেলার কথা। কিছুতেই ঘুমুতে পারছিলাম না—পড়বার চেষ্টা করছিলাম—রাত ক'টা হবে জানিনা। খাটে লাগানো আলোটা জ্বলছিল—মনে হ'ল কে যেন দরজায় টোকা মারছে। বললাম "এসো", আশ্চর্য্য জিল এসে ঘরে ঢুকল কেমন যেন শুকনো চেহারা, বিহ্বল চোখ—উঠে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম—"এত রাতে! তুমি?"

"অন্য কাউকে আশা করছিলে বুঝি," জিল বিদ্রূপ করে। একটু থামে—হঠাৎ প্রশ্ন করে "তুমি পেসিলাকে ভালবাস?"

সহজ ভাবে উত্তর দিলাম "হাঁ, কেন?"

জিলের ঠোঁটের উপরটা কিরকম কুঁচকে উঠলো, কি আছে ওর, রূপ—গুন না টাকা পয়সা কি?" প্রত্যেকটি কথা বলার মধ্যে জিলের উপচে পড়া ঘেন্না সহজেই চোখে পড়ে। আমাকে নিরুত্তর দেখে নিজে থেকেই বলে—"তুমি এত বড় বোকা আমি আগে ভাবিনি।"

সে অনেক কথা বলে গেল—সে নাকি আমায় গোড়া থেকেই ভালবেসেছে এবং আমি বোকা বলে তা বুঝতে পারিনি—পেসিলার চাইতে তার অবস্থা ঢের ভালো—তার উপর রূপ? সে কথাটা আর নিজের মুখে বলেনা—দেহের উপর থেকে রাত্রের আবরণী পোষাকটি খুলে ফেলে—অপরূপ অংগ সৌষ্ঠব—রূপ যেন কানায় কানায় ভরা—টসটসে যৌবন। এভাবে

চিত্র শিল্পীর মত—নারীর নগ্নরূপ কখনো দেখিনি—কিছুক্ষণ আমি চোখ ফেরাতে পারিনি।

উত্তেজনা কেটে গেল মাটীতে ছড়ানো অন্তর্বাস গুলো কুড়িয়ে নিয়ে জিল পর্দ্দার অন্তরালে চলে গেল—আমি তখনও বজ্রাহতের মত বসেছিলাম—গায়ে আবরণী জড়িয়ে সে যখন বেরিয়ে এলো মুখ তার বিমর্ষ—একটি কথাও না বলে—চলে গেল, আমার সারা মনে চিন্তার ঘূর্ণি উড়িয়ে দিয়ে।

পরদিন ঘুম থেকে উঠতে দেরী হ'ল। বেয়ারা সকালের চায়ের সংগে একটা চিঠি দিয়ে গেল—জিলের চিঠি—সামান্য ক'টা লাইন—"আজ বুঝতে পেরেছি কেন তুমি পেসিলাকে ভালবাস। আশাকরি তোমরা সুখী হবে—আমি চললাম। প্রীতি নিও—জিল।"

চিঠি দেখে পেসিলা খুব মৃদুস্বরে বলে, "জানতাম।"

কৌতুহল হ'ল, "কিরকম ?"

"কাল রাতে তোমার কাছ থেকে এসে জিল আমাকে ঘুম থেকে তুলেছিল। বললে সে তোমায় ভালোবাসে—বুঝলাম ও ভীষণ উত্তেজিত—কি মনে হল—বললাম "বেশতো, এতে ক্ষেপে যাচ্ছ কেন—আমি না হয়—তোমাদের মাঝখান থেকে সরে যাবো।" কথাটা বলেছিলাম বটে, তবে আমার মন থেকে কিনা জানিনা—ভেবেছিলাম রাত্রিটা কেটে গেলে ওর মাথা ঠাণ্ডা হবে—সকালে যাহোক বোঝাপড়া করা যাবে। কিন্তু তার আর দরকার হল না। তখনও ঘুমথেকে উঠিনি—আমার কাছে

বিদায় নিয়ে সে চলে গেল, শুভকামনা প্রকাশ করে—যেন আমরা সুখী হই।”

সেই থেকে আমার ও পেসিলার যুগ্মজীবন এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলতে চাইনা। ক’মাস এভাবে কেটেছিল মনে নেই। তবে হঠাৎ এই চাকরির খবর পেলাম—ভারতে গিয়ে নদীতে ঘুরে বেড়াতে হবে—রোজকার ভালো, পেসিলাও মত দিল—চার বছরের কনট্রাক্ট সই করে চলে এলাম। তিন বছর কেটেছে—এখনও একবছর বাকি। তবে আবার ফিরে যেতে পারবো—এই অবধি বলে সাহেব হাতের সোনার আংটী আমার সামনে তুলে ধরে—তাতে পেসিলার নাম লেখা।

কি মনে হল জিজ্ঞেস করলাম “সে এখনও বিয়ে করেনি—”

সাহেব ম্লান হাসে “না, মাঝেমাঝে চিঠি পাই—আমিও লিখি। আচ্ছা, সত্যি করে বলতো এরকমের সম্বন্ধ গড়ে ওঠার পর তোমাদের দেশের লোক প্রেমিকাকে ছেড়ে দূর দেশে চাকরি নিতে পারতো ?”

চট করে উত্তর দিতে পারিনি কারণ আমারই যে মন ছটফট করছে রাণীর জন্য, এই ক’দিনের মধ্যেই। রাণী, নাইবা হলাম আমি সাহেবের মত বীর, কর্মী—আমি যে তোমাকে ভাল-বেসেছি—এই তো যথেষ্ট—আর আমি কিছু চাই না—আমি চাই তোমাকে—আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে।

মনে আছে মেঘনার উপর দিয়ে জাহাজ চলছিল—জাহাজের

ক্যাপ্টেনের সংগে ডেকে দাঁড়িয়েছিলাম—হঠাৎ সাহেব বলে "দেখছো এখানকার জল কি রকম মজার!"

জলের দিকে তাকালাম—দু'রকম জল—সাদা আর ঘোলা। সাহেব বুঝিয়ে দেয় "পদ্মা আর মেঘনা—পদ্মার জল ঘোলা—মেঘনার জল সাদা—এরা পাশাপাশি বয়ে যাচ্ছে—অথচ পদ্মার জল মেঘনায় যায় না—মেঘনার জল পদ্মায় আসে না।"

এ কথা আগে শুনিনি, বোধ হয় অবাক হলাম "তাই নাকি, বড় আশ্চর্য্য তো!"

"আরও আশ্চর্য্য কি জানো—দু' নদীতে দু' রকম মাছ। এ নদীর মাছ ও নদীতে যায় না আবার ও নদীর মাছ এ নদীতে আসে না।"

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম নদীর জাত-বিচার—এও এক রকমের শুচিবাই—কি যেন বলতে গেলাম—নজর পড়লো সাহেব মৃদু হাসছে, জিজ্ঞেস করলাম, "কি হ'লো হাসছো কেন ?"

"ঈশ্বরের ভাগের উপর কেউ মাথা গলায় না। এই যে দু' রকম নদীর জল—দু' রকম মাছ—এরাতো মারামারি করে না, পাশাপাশি বাস করে।"

"তাতো বটেই—" সায় দিতে যাচ্ছিলাম।

"অথচ এই দেখো, তোমাদের হিন্দুস্থান, পাকিস্থান—একই দেশের লোক—সারা দিন মারামারি করছে। আমাদের এখন সুবিধা, হিন্দুস্থান পাকিস্থান দুদিকেই আমরা খাতির পাই—মানুষের বোকামি দেখি আর হাসি।"

খুব কড়া উত্তর দিলাম, "যা কিছু এখন ঘট্‌ছে—তার মূলে তো রয়েছে তোমাদের রাজনীতি—আমাদের মধ্যে এই যে প্রভেদ—"

সাহেব কথা না শুনে হেসে উঠে, "সবচেয়ে মজা কি জান—দোষটা তোমরা সব সময় অন্য লোকের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে চাও। বিশ্বাস করো, ইংরাজ যদি সবটাই মিথ্যে প্রচার করে থাকে, তোমাদের মধ্যে সত্যিকারের প্রভেদ না থাকলে দুটো

রাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারতো না।" ঝগড়া করার প্রবৃত্তি ছিল না। চুপ করে গেলাম—সাহেব কিন্তু তখনও থামে না, "ইতিহাসের পাতায় দেখবে, পাঠান, মোগল আমলে-মুসলমান রাজা—হিন্দু প্রজা—ইংরাজ আমলে রাজাপ্রজার সম্বন্ধ না থাকলেও প্রভেদ গেল না—তোমাদের সমাজ, সংস্কার, রীতিনীতি, ধর্ম্ম সব কিছুই অন্য রকম। তা যদি না হত অন্ততঃ স্বাধীনতার পর তোমরা মিলতে পারতে—কিন্তু তাও পারলে না; আজতো ইংরাজ নেই, তবে আর তার উপরে দোষ চাপিয়ে এখনো নিজেদের ঠকাচ্ছ কেন ?"

যুক্তি অকাট্য কিন্তু কথাটা সত্যি কিনা ঠিক বুঝলাম না।

এক জাহাজে লোক বোঝাই করা হচ্ছে—কাসটম্সের কড়া পাহারা—বিছানাপত্তর থেকে সুরু করে কারো শরীর পর্য্যন্ত বাদ যায় না, যদি কেউ লুকিয়ে নিয়ে যায় এ রাজ্যের সম্পদ। প্রায় পাঁচ মিনিট ধরে এক একজনকে পরীক্ষা করা হয়। দূর গ্রাম থেকে কতদিন না খেয়ে এরা এসেছে ষ্টীমার ঘাটে, এখানেও অপেক্ষা করছে ষ্টীমারের জন্য দিনের পর দিন রোদে, জলে। তার ওপর ষ্টীমারে উঠতে গিয়ে নির্যাতন—এক বুড়ি এসে নালিশ করে, "আমার কাছে পঞ্চাশ টাকার নোট ছিল এরা কেড়ে নিয়েছে।"

জিজ্ঞেস করলাম "তোমায় রসিদ দিয়েছে ?"

"কিছু দেয়নি বাবু", বুড়ি হাউ হাউ করে কাঁদে। কাসটম্‌সের বড়কর্তা জাহাজের ডেকে বসে টিফিনক্যারীয়ারে আনা লাঞ্চ খাচ্ছিলেন। সেখানেই গিয়ে বসলাম, ইতিবৃত্ত জানালাম।

ভদ্রলোক নির্বিকারভাবে হাসলেন, "ওদের কথা শুনবেন না। সব মিথ্যেবাদী।" আরো অনেক কথা বলে গেলেন, যার অর্থ দাঁড়ায়—যথেষ্ট অভিজ্ঞতা তিনি পেয়েছেন এই বাস্তুহারাদের ব্যাপারে। কত রকম করে যে এরা রাষ্ট্রকে ঠকাতে চায় তার ইয়ত্তা নেই। কথায় কথায় মণি দাসীর কথা উঠলো। কিছুদিন আগের কথা। সারা গায় গয়না পরে সে এ দেশ ছেড়ে চলে যাবার চেষ্টা করছিল। কাসটম্‌সের লোক এত গয়না নিয়ে যেতে দেয় না। "মেয়েটি সাহসী", কাসটম্‌সের কর্তা বলে, "আমাকে এক পার্‌সন্যাল চিঠি লিখে বসল।"

জিজ্ঞেস করলাম "কি রকম?"

"সে লিখলে, আমার সংগে দেখা করতে চায়, কেন জানিনা, সম্মতি দিলাম, মেয়েটি আমার বাংলোয় এলো—বিগত যৌবনা তবু সুশ্রী।"

জিজ্ঞেস করলাম "আমার সংগে দেখা করতে চেয়েছ কেন?"

"দেখুন" মেয়েটি ইতস্ততঃ করে, "এ অঞ্চলের অনেকেই আমাকে চেনে, নিজের দেহ বিক্রী করে এত বছরে—এই ক'টা গয়না জমিয়েছি। এই আমার সম্বল। এ যদি আপনারা কেড়ে নেন, তবে অন্য রাজ্যে গিয়ে কার উপর বেঁচে থাকবো"।

কাসটম্‌স অফিসার হাসলেন, "বড় করুণ মিনতি, বুঝলাম বেচারীর মূলধন চলে গেছে, এখন জমানো টাকা ভাঙ্গতে হবে। বিশ্বাস করুন ক'দিন ধরে মেয়েটির বিষয় খোঁজখবর নিলাম, শেষ পর্যন্ত কি বেরুল জানেন ?"

"কি ?"

"আপনি ভাবতেও পারবেন না, বেরুল মেয়েটি আমাদেরই জাতের। ঠিক দেহ বিক্রী তার পেশা নয়, সে নিজেকে ভাড়া খাটায়, এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কারুর স্ত্রী সেজে, কারুর মা সেজে গয়না পরে পার হয়ে যায়, গয়না ফিরিয়ে দেয় মালিকের হাতে, কমিশন পায় ভালো রকম।" কথা শেষ করে কাসটম্‌স অফিসার হাসতে থাকেন—আমিও হাসি। উনি বলেন "এ রকম অনেক দেখেছি, কাউকেই আর বিশ্বাস হয় না, তবু চলুন, দেখি এ মেয়েটির কি ব্যাপার।"

ক্যাপটেনকে কাসটম্‌সের কড়াকড়ির কথা বলছিলাম। ক্যাপটেন্ বলে, "ইউরোপে এত কড়াকড়ি কখনো দেখিনি। এখানে দুটো ক্যামেরা নিয়ে এলে, একটা কেড়ে নেয় অথচ ফ্রান্সে কি ইংল্যাণ্ডে বাড়্‌তি ক্যামেরার ডিউটি দিলেই চলে যায়।" একটু চুপ করে থেকে বলে, "গরীব উদ্বাস্তুদের এরা ব্যস্ত করে সবচেয়ে বেশী। কিন্তু আসল গোলমালের কোন সন্ধান পায় না।"

জিজ্ঞেস করলাম, "কি বিষয়ে ?"

"এই ধরনা পয়লা এপ্রিল থেকে পান প্রথা বর্জন করা হয়েছে এখানে, অথচ আমি রোজ জিন খাই—টেবিলের উপর একই ধরণের দুটো শিশি রাখি—একটায় জিন, আরেকটায় সাদা জল।"

"তাতে কি হয়!"

"যদি কাসটম্‌সের লোক আসে—সাদা জল দিয়ে অরেঞ্জ-স্কোয়াশ দিই, আমার বেলা অরেঞ্জস্কোয়াশএর সংগে জিন মিশিয়ে নিই।"

বিজ্ঞের হাসি হাসলাম, "তাও নাকি কখনো হয়, এটুকু আর তারা ধরতে পারবে না?"

"পারে না বলেই তো বলছি। সেদিন গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুর আসছিলাম। আমি জিন খাচ্ছি, কাসটম্‌স অফিসারকে জলের সংগে অরেঞ্জস্কোয়াশ মিশিয়ে দিলাম। ধরতেও পারলে না। কিন্তু খানিক বাদে সে উঠে গেল পাশের কেবিনে ডাক্তরের সংগে পরামর্শ করতে। প্রায় আধ ঘণ্টা হয়ে যায় অথচ এরা বেরোয় না। কি মনে হলো ডাক্তারের কেবিনে ঢুকে পড়লাম। ডাক্তার আর কাসটম্‌স অফিসার দু'জনের হাতে রঙ্গীন পানীয়। হাতে একটা শিশি বড় করে লেখা মেডিসিন। ঠাট্টা করে বললাম, "তোমরাই যদি সব ওষুধ খেয়ে ফেলবে তবে আর উদ্বাস্তুদের দেবে কি?"

তারা হাসে, বলে, "তোমার শরীরটাও যদি ঠিক নেই মনে হয় তো এক ডোজ ওষধ খেতে পার।"

বললাম, "এমন দাওয়াই পেলে তো আমি সারাদিনই অসুখে পড়ে থাকবো।"

নিজের হাসি পেল, "তা হলে আর এ নিষেধাজ্ঞা কেন ?"

"কোন মানে হয় না", সাহেব বলে, "জোর করে কারুর নৈতিক চরিত্র ভালো করা যায় না। জানি শেষ পর্যন্ত কয়েক-জন স্মাগ্‌লারের পকেট ভর্তি হবে। তাইতো বলছিলাম গরীবদের ওপর এত নির্যাতন করে অথচ এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন।"

সে দিন সকাল বেলা কাগজ পড়ছিলাম—কলকাতা সম্বন্ধে জ্বলজ্বলে মিথ্যে কথা—পড়তে পড়তে হাসি পেল। সাহেব জুতোর হীলে পাইপ ঠোকে, "হাসি কিসের ?"

বললাম, "কাগজে কি রকম মিথ্যে লিখেছে তাই দেখছি।"

"কৈ দেখি", সাহেব চোখ বুলিয়ে যায়—কলকাতায় নাকি জাতীয় পোষাক পরে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোন লোক হাঁটা চলা করতে পারেনা—তাহলেই কেটে ফেলা হয়। সাহেব হাসে, "সে কি ! আমার কোম্পানীর সারেংগরা তো সবাই লুংগী পরে ঘুরে বেড়ায়।"

বললাম, "তবেই বোঝ, এত মিথ্যে কথা লিখলে মানুষ ঘাবড়াবেনা কেন ?"

সাহেব কি যেন ভেবে বলে, "এবার খবর গুলো না বাড়িয়ে কেউ লিখছেনা, একটা ঘটনার কথা জানি, চাঁদপুর থেকে কোন জাহাজে উদ্বাস্তুদের নিয়ে যাচ্ছিল গোয়ালন্দ। মাঝপথে

জন ত্রিশেক গুণ্ডা নৌকা করে এসে জাহাজ আটক করার চেষ্টা করে। খালাসীদের সাথে তাদের হাতাহাতি হয়।"

কৌতুহল প্রকাশ করলাম, "কাগজে কি যেন দেখেছিলাম বটে, ব্যাপার কি বলুন তো।"

"বিশেষ কিছু নয় জাহাজ বিপদ সূচক বাঁশী বাজায় তাই শুনে আরেকটী ষ্টীমার সেখানে এসে পড়ে। উদাস্তুদের নিয়ে চাঁদপুরে ফিরে যায়।"

হাসলাম, "তাহলে আর গোলমাল হয়নি কি বলছেন?"

"ক্ষতি কারুর হয় নি, কারো গায়ে আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি। আর সেই দিনই সন্ধ্যে বেলায় পুলিশ সংগে দিয়ে তাদের আবার গোয়ালন্দ পাঠিয়ে দেওয়া হয়।" সাহেব একটু থামে, বলে, "মজা কি হলো জান এই গোলমালের সময় কে একজন বুঝি জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতরে তীরে ওঠে, লুংগী পরে পালিয়ে যায়, সে গিয়ে তার চাক্ষুষ বিবরণ দিয়েছে প্রায় দু হাজার উদ্বাস্তু হতাহত।"

একটা যুৎসই উত্তর খুঁজছিলাম, তার আগেই সাহেব বলে, "প্রান খুলে তোমার সংগে কথা বলছি কারণ জানি তুমি কিছু মনে করবে না। আচ্ছা বলতো ঐ যে কজন গুণ্ডা এসেছিলো তাদের এত ভয় করলো কেন এই দু'শজন উদ্বাস্তু।

"ভয় না করে আর উপায় কি?"

"কেন, এরা তো মারামারিও করতে পারতো, না হয়

ক'জন মরেই যেত, তাতে—কি হয়েছে' এটা তো তাদেরও রাজ্য, এখানে তো তাদেরও নাগরিক সত্ব আছে।"

বললাম, "সে সত্ব আর কে মানছে ?"

সাহেবের কথাটা পছন্দ হয় না, "মানাতে চাইলেই মানানো যায়, ভয়ে ভয়ে পালিয়ে বেড়ালে কে মানবে। অদ্ভুত ভীতু জাত, বিশেষ করে বাংগালীরা—"

সাহেব আগের ঘটনা বলে যায়' এদেশ তখন সবে স্বাধীন হয়েছে, সে গোয়ালন্দ থেকে ট্রেনে উঠেছিল কলকাতা যাবার জন্যে। কামরায় সবাই বিছানা বিছিয়ে শুয়ে আছে জায়গা ছাড়বেনা। সাহেব মেজাজ দেখিয়ে জায়গা ছেড়ে দিতে বলে, জোর করে একজনের বিছানা মাটিতে ফেলেও দেয়। বাকি আটজন একজোটে ওকে মারতে আসে, সাহেব ভয় পায় নি, সামনের জনের মুখে সজোরে ঘুসি মারে, গোটা দুই দাঁত তার ভেংগে যায়, একজনের দিকে লাথি চালায়, সে জখম হয়ে বসে পড়ে, ইতিমধ্যে একজন লাঠি চালিয়ে সাহেবের হাতঘড়ি ভেংগে দিয়েছে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সন্ধি হয়ে গেল, তারা সাহেবকে সিট্ ছেড়ে দেয়, বাকি রাস্তাটা বন্ধু ভাবেই কেটেছিল। সাহেব হাসে, "এই আমাদের শিক্ষা—সংখ্যায় বেশী দেখে ভয় পাই না, মানের—চেয়ে প্রান্ বড় নয় আমাদের কাছে।"

মনে মনে ভাবলাম, এ প্রভেদ তো আছেই, তা না হলে মাত্র কজন সৈন্য নিয়ে, কোন সাহসে এই নাবিকরা দেশ

জয় করতে এসেছিল—যেখানে কোটি কোটি মানুষ আর তা না হলে কেনই বা বিনা দ্বিধায় আমাদের পূর্ব পুরুষরা সমস্ত দেশটা তুলে দিয়েছিল বিদেশীদের হাতে। উপেক্ষার হাসি মাখা সাহেবের মুখ—বীরের বংশধর সে—অপ্রস্তুতের হাসিমাখা আমি—ভীরু কলংকিত পূর্বপুরুষদের কাপুরুষতার তর্পন করছি।

সাহেবের প্রতি রোজই বিরক্ত হতাম—অল্প অল্প করে। আমাদের বিদ্রুপ করাই যেন ওর কাজ—কথায় কথায় ঘুরিয়ে চড় মারে।

সেদিন পুলিশের সংগে—সহর বেড়াতে গিয়েছিলাম—ফিরতে রাত্রি হয়ে গেল। ডেকের উপর সাহেব বসে আছে—খবর জিগ্‌গেস করলাম—কোন উত্তর দিলে না—চোখ দুটো টকটকে—লাল—বোধহয় নেশা করেছে, ঠিক বুঝলাম না। এড়িয়ে গেলাম—প্রায় আধঘণ্টা বাদে সেখানে এসে দেখি—একই অবস্থা, সাহেব তখনো বসে আছে। সন্দেহ হল, জিগ্‌গেস করলাম,—"তোমার কি শরীর খারাপ? কি হয়েছে?"

নেশার ঝোকে কি রকম যেন বেসামাল হেসে ওঠে, "পেসিলা চিঠি দিয়েছে।"

তখুনি বুকটা ধড়াস করে উঠলো, "কি লিখেছে?"

সাহেব উত্তর দিলে না—একটা চিঠি এগিয়ে দিলে। পড়া সংগত হবে কি না, না ভেবেই এক নিঃশ্বাসে—চিঠি পড়ে

ফেল্‌লাম—সেন্টিমেণ্ট ভরা চিঠি—পেসিলার চাকরী গেছে—অত্যন্ত আর্থিক কষ্ট—তিন খানি চিঠি এ মাসে সে লিখেছিল, উত্তর পায় নি। এই তার শেষ চিঠি—এর উত্তর এবং এখনি কিছু টাকা না পেলে—তার জীবন ধারনের কোন উপায় নেই—হয়তো শুধু বেঁচে থাকবার জন্য কাউকে বিয়ে করতে হবে।”

কি জবাব দেব ভাবছিলাম, সাহেব জড়ানো গলায় বললে “চিঠির তারিখ দেখো—।” দেখলাম ১৫ই মার্চ।

“প্রায় একমাস বাদে পেলাম—তিন জায়গায় ঘুরে চিঠি এসেছে—আগের দুটো চিঠি পাইনি—আহা কি সুখের জীবন আমার—পেসিলা আমার জীবনের একমাত্র আশা—তাকে বোধহয় জন্মের মত হারালাম।”

সাহেবকে এত বিচলিত হতে দেখিনি, কিরকম যেন আরও গম্ভীর হয়ে গেল, “তোমরা ঢের সুখী—আমাদের চেয়েও ঢের সুখী—তোমাদের মত ‘হোমসিক’ হলেই ভালো করতাম।” সাহেব আর এক পেগ মুখের মধ্যে ঢেলে দিলে।

. সারা রাত জেগে থেকে, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে—ভাবলাম বাসনাদিকে চিঠি লিখে সব জানাই। মনটা হাল্কা হয়ে গেল-দীর্ঘ তিন পাতা চিঠি লিখে উঠলাম—প্রায় ভোর হয়ে এসেছে—

দেখছি আমার অসুখ করেছে—ছোঁয়াচে রোগ ঘরের মধ্যে অন্যের ঢোকা বারণ—রাণী দরজার কাছ থেকে দেখে চলে গেল, তাকেও ঢুকতে দেওয়া হয়নি—এ বড় কষ্ট, একা একা বিছানায় পড়ে থাকা। মাথা ভার, চোখ জ্বলছে কি জানি কি হল জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে—অনুভব করলাম মাথায় কার ঠাণ্ডা হাত—আস্তে আস্তে চোখ তুলে তাকালাম—বাসনাদি বসে আছেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও করুণ স্বরে বললাম "আপনি চলে যান; ছোঁয়াচে রোগ।"

বাসনাদি হাসলেন—আর উত্তর দিতে পারলাম না—কোলের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভেঙ্গে গেল—এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম—সামনে বাসনাদিকে রাত্রে লেখা চিঠিটা পড়ে রয়েছে। মনে হল—কি হবে ও চিঠি পাঠিয়ে, মিছি মিছি কষ্ট পাবেন, সারাদিনই মানুষের দুঃখের সংগে যে নিজের বরাত জড়িয়ে রয়েছে—সত্যি তাকে নতুন করে কষ্ট দিতে মায়া হয়।

সেই বিয়াল্লিশের মন্বন্তর দুর্ভিক্ষ-পিড়ীতের দল যখন হাজির হল কলকাতার সহরে—লঙ্গর খানার ধুম পড়ে গেল—সেই সময় দেখেছি বাসনাদিকে—কাপড় বিলিয়ে বেড়াচ্ছেন। ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বাড়ী বাড়ী কাপড় কুড়িয়ে এনে—বিভিন্ন সেন্টারে দিয়ে আসতেন—মনে আছে—আমাদের বাড়ী এসে কাপড় চেয়েছিলেন-বাড়ীতে মেয়েরা কেউ ছিলনা—বেরিয়ে গেছে—আমি তখন স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ি—বেরিয়ে এসে কথা বললাম—"কাকে চাই ?"

"মা কোথায় ? বাসনাদি এমন ভাবে প্রশ্ন করলেন যেন মা'র সঙ্গে অনেক দিনের আলাপ।

"আমার মা নেই।"

"তাই নাকি ? মেয়েরা কে আছেন ?"

"বৌদিরা কলকাতার বাইরে।"

বাসনাদি হাসলেন, "তা হলে আর হল না দেখছি।"

জিজ্ঞেস করলাম, "কি চাই বলুন ?"

"ছেঁড়া পুরোনো কাপড় ভিক্ষে করতে এসেছিলাম। ডেসটিটিউটদের জন্যে।"

কি ভেবে বললাম, "বাড়ীতে তো কেউ নেই। আমার কয়েকটা পুরোণো জিনিষ আছে নেবেন ?"
বাসনাদি উৎসাহ প্রকাশ করেন, "নিশ্চয়ই।"

কতকগুলো হাফপ্যান্ট, কয়েকটা সিল্কের অল্প ছেঁড়া জামা—একটা পুটলী করে নিয়ে এলাম। বাসনাদি আমার নাম ঠিকানা নোট বইয়ে লিখে নিলেন।

কয়েক দিন বাদে সকালবেলা আমি কাগজ পড়ছি—দারওয়ান এসে খবর দিলে কে আমায় টেলিফোনে ডাকছে।
"হ্যালো—কে ?"
"হ্যালো—কে—, আমি বাসনাদি কথা বলছি—"
"বাসনাদি," চিনতে মুস্কিল হয়।
"সে দিন তোমার কাছ থেকে সার্ট, প্যান্ট নিয়ে এলাম।"
"ও হা বলুন," আমি লজ্জিত হই।
"একটা কাজ করবে ভাই," অত্যন্ত পরিচিতের মত তিনি কথা বলেন
"কি বলুন ?"
"তোমাদের স্কুলে কিছু চাঁদা তোলো—দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের খাওয়াবার জন্যে—এক আনা করে বড় বড় রুটী আর তরকারী তোমাদের দেবো-একশ জন লোক খাওয়াতে ছ' টাকা চার আনা খরচ হবে।"

এ রকম কাজে আমায় কেউ কখনো আহ্বান করেনি, কি মনে হ'ল—কথা দিয়ে দিলাম, "নিশ্চয় করবো কিন্তু আপনাকে খবর দেবো কি করে ?"

বাসনাদি হাসলেন, "সে ভাবনা নেই—আমি নিজেই খবর নে'ব।"

স্কুলে গিয়ে হেড মাষ্টার মশাইকে বললাম, তিনি খুব খুসী—বললেন, "এ যদি করতে পারো, আমরা সত্যি আনন্দ পাব। সে ক'দিন কি ভীষণ উত্তেজনা—ক্লাসে ক্লাসে বলে এসেছি—যারা বাড়ী থেকে টাকা আনতে পারেনি—তারা টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে চাঁদা দিয়ে গেছে। এক সপ্তাহের মধ্যে দু'শ টাকা চাঁদা উঠে গেল—ছুটীর পর স্কুলে অপেক্ষা করি—রিক্সা করে দু'শ লোকের খাবার আসে—প্রায় এক ঘণ্টা লাগে সকলকে বিলিয়ে দিতে।

হেড মাষ্টার মশাই চুপ করে বসে থাকেন—চোখে তাঁর জল আসে, বলেন, "এমনি নরম মনটা আজীবন রেখো, নিজে আনন্দ পাবে।"

তখন সে কথার অর্থ পুরো বুঝিনি, এখন বুঝতে পারি। মাঝে মাঝে বাসনাদি এসেও দেখাশুনা করে যেতেন—বলতেন, "এমনি করে সব স্কুলের ছেলেদের নাচিয়ে দিতে হয়—তারা খুব সাহায্য করে—কারণ প্রাণটা বড় নরম কিনা। মানুষের দুঃখ এরাই বোঝে"

একদিনের কথা মনে পড়ছে রাত্রি ৯টা পড়া শেষ করে খেতে যাচ্ছি—বাসনাদি এসে হাজির উস্কো খুস্কো চুল কেমন যেন বিপদ মাখা মুখ।

"কি হয়েছে বাসনাদি?"

বাসনাদি হাসবার চেষ্টা করলেন, "শোন, এবার থেকে তোমায় অনেক কাজ করতে হবে—অনেক অনেক কাজ।"

বললাম "পারলে নিশ্চয়ই করব।"

"জানতাম তুমি আমার কথা শুনবে-নীচে গাড়ীতে একটা বাক্স আছে উপরে নিয়ে এসো।"

কিছু বুঝলাম না, একটা চাকর নিয়ে বাক্সটা উপরে নিয়ে এলাম এক গাদা ছেঁড়া কাপড়, "এগুলো বিলি করতে হবে-"

"কোথায় ?"

"সে নিয়ে ভেবো না, অনেকে আছে যারা কাজ করবে তোমায় শুধু এগুলো এক এক জনের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। খবর দিলে তারা এসেও নিয়ে যেতে পারে।"

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে বাসনাদি সব জিনিষটা পরিস্কার করে দেন, "তুমি আমার বাড়ী যাওনি, গেলে বুঝবে কি মুস্কিলে পড়েছি। আমার মন চায় দশ জনের কাজ করি কিন্তু আমার বাড়ীর লোক চায় না তারা বলে এতে নাকি তাদের নাম খারাপ হয়ে যায়।"

বললাম, "তা কি করে হবে, সেবা—"

বাসনাদি হাসেন, "সবাই যদি আমার ভাইটীর মত বুদ্ধিমান হত তা হলে ত আর কথাই ছিল না। অথচ কত জায়গায় আমি কত কাজ স্থুরু করেছি তারা এখন ভাববে বড়লোক—চাল মারতে দু'দিন লোক দেখানো কাজ করে চলে গেল।"

সেইদিন থেকে বাসনাদির কাজ করেছি কোথাও কোন খবর পেলে বাসনাদিকে জানিয়ে দিয়েছি ফোনে কিংম্বা বাড়ীতে গিয়ে। আমার বাড়ী আসায় বাসনাদির অসুবিধা ছিল না। বাড়ীর মেয়েদের সংগে পরিচয় সূত্রে আসা যাও-য়ার সুবিধা ছিল।

একদিন দুপুর বেলা গেলাম বাসনাদির কাছে বাসনাদি ঘরে শুয়েছিলেন, আমি চাকর দিয়ে খবর পাঠালাম। বাইরের ঘরে বসে আছি নিঁখুত পরিপাটী করে শান্তিনিকেতন ঢঙে সাজান আসবাব পত্র ছোট ছোট আলপনা আকা কাঁচের টেবিল ।

বাসনাদি ঘুম থেকে উঠে এলেন, "ও তুমি, এসো ঘরে এসো।"

"খুব ঘুমুচ্ছিলেন তো", আমি হাসলাম।

"কি করি বল, কিছুতো একটা করতে হবে।" বাসনাদির ঘরে ঢুকলেই রবীন্দ্রনাথের ছবিটা চোখে পড়ে বড় সুন্দর ছবি।

কথায় কথায় রিলিফ ক্যাম্পের কথা উঠল, জানালাম মেয়ে ভলান্টিয়াররা আর যায় না। বাসনাদি কেমন যেন হয়ে গেলেন, "এ আমি জানতাম আমি না গেলে তারা আসবে না। কেনই বা তাদের বাড়ী থেকে পাঠাতে যাবে? আমার বাড়ীর লোক এত বুঝে সুঝেও যদি আমাকে ছাড়তে না পারে তবে আর ওদের বাড়ী থেকে ছাড়তে যাবে কোন দুঃখে।"

কোন জবাব দিইনি, চুপ করে ওঁর মুখের দিকে চেয়েছিলাম

ঘুম থেকে উঠার জন্যে মুখটা ফুলে রয়েছে। পরণে সাধারণ ভাবে শাড়ী পরা, ভিজে চুল শুকিয়ে এসেছে মুখে বিষাদের ছায়া পড়ে, চোখে করুণ ভাব ; "এদেশে মেয়েদের কোন স্থান নেই মুখে সব দেবী বলে, ব্যবহারে কুকুর বেড়ালের চেয়ে অধম আমরা, আমাদের একটা কথাও কেউ শোনেনা।"

বাসনাদির প্রত্যেকটী কথায় অসহায় ভাব ফুটে উঠে। "তুমিও যে কাজ করতে পারো, তা করারও স্বাধীনতা আমার নেই। সেবা করা এদেশে অপরাধ। সীতার মত যারা অন্যায়কে মাথা পেতে নিয়ে জীবন বিসর্জ্জন করে তারাই এদেশে মান্য পায় সুভদ্রার দল, সকলের উপকার করে অথচ সকলের কাছে গঞ্জনা শোনে।"

আরও কত কথা বলে গেলেন, সব শুনিনি, শুধু দেখছিলাম- দয়া মায়ার প্রতিমূর্ত্তি বাসনাদি আমার, সব কিছু অন্যায় সহ্য করে নিরুপায় ভাবে বসে আছেন কি করুণ। আর থাকতে পারিনি, পায়ে হাত দিয়ে বাসনাদিকে প্রণাম করে-ছিলাম মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, "যেমন করে পারি, আমি যত দিন আছি, তোমার কাজ করে দেবো, কোনদিন কোন প্রশ্ন করবো না।" জানি না সে প্রতিজ্ঞা রাখতে পেরেছি কি না।

আমি তখন পাটনায় বেড়াতে গেছি খবর পেলাম বাসনাদির বিয়ে, খুব বড় ঘরের ছেলের সঙ্গে। নিজে থাকতে পারলামনা বলে দুঃখ হল, শুভ কামনা জানিয়ে তার করে

দিলাম! দিন কয়েক বাদে ছোট্ট চিঠি পেলাম, "এক জেলখানা থেকে আরেক জেলখানায় যাচ্ছি জানি না এবার সশ্রম কি না।" চিঠিটা আমায় সেদিন চঞ্চল করে তুলেছিল।

বাসনাদির সঙ্গে দেখা হল মাস কয়েক বাদে কলকাতায়। ঠিক আগের মতই আছেন একগাল হেসে আমার কাছে এগিয়ে আসেন হাতদুটী ধরে সস্নেহে তাকিয়ে থাকেন জিজ্ঞেস করলাম, "কি খবর?"

"আবার তোমাদের সংগে কাজ করব।"

ঠিক বুঝতে পারলাম না, বাসনাদি পরিস্কার করে দেন 'কাজ করার অনুমতি পেয়েছি। আমার স্বামী নির্ব্বিবাদের মানুষ, নিজের কাজ নিয়ে থাকেন আমি যাই করি না কেন ওনার সবেতেই সহানুভুতি "

শুনে বড় আনন্দ হল বললাম, "আমি জানতাম আপনাকে একদিন না একদিন সবাই বুঝবে।"

বাসনাদি লজ্জামাখা স্বরে বলেন, "সবাই বুঝুক না বুঝুক কিছু এসে যায় না—উনি যে বুঝেছেন, এতেই আমি খুসি। এখন উনি মত দিয়েছেন বলে বাড়ীর কারুরই আর আপত্তি নেই।"

জিজ্ঞেস করলাম "কি করবেন ঠিক করেছেন"

"সেলাইএর ব্যবস্থা, সব রকম সেলাই অনেকগুলো মেয়ে পেয়েছি যারা কাজ শিখবে, কাজ করবে। উনি নিচের একটা ঘর ছেড়ে দিয়েছেন এই জন্যে।"

বললাম "প্রার্থনা করি, আপনার এতদিনের কামনা যেন পূর্ণ হয়।"

বাসনাদি আগ্রহের সংগে বললেন, "তুমিও তো বড় হয়েছ কলেজে পড়ছ, এরপর পাশ করে বেরোও, তোমাকে দিয়েও একটা নতুন ধরণের প্রতিষ্ঠান খুলব, যাতে বয়স হয়ে গেছে যে সব মেয়ের অথচ শিক্ষা পায়নি তারা লেখাপড়া শিখতে পারে।

বললাম, "পাশ করে বেরোতে এখনো দু'বছর দেরী ততদিন সেলায়ের কাজ শিখি।"

বাসনাদি কি যেন ভেবে হেসে বললেন, "তার চেয়ে বরং তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে কর, তোমার বউ আমার ঠিক এসিসট্যাণ্ট হবে।"

উত্তর দিলাম, "পাগল হয়েছেন, বিরে করা, বৌকে আপনার হাতে দেওয়া, তাহলে আর রক্ষা আছে ?"

একদিন জন্মদিনের উপহার কিনতে বেংগল ষ্টোরে ঢুকেছিলাম বাসনাদির সংগে দেখা।

জিজ্ঞেস করলাম "এখানে যে কি কিনছেন ?"

বাসনাদি হাসলেন; "যদি বলি কিনতে নয়; বিক্রী করতে এসেছি।"

"সে আবার কি ?"

বাসনাদি আমায় ধরে নিয়ে গেলেন অনেক সুন্দর সুন্দর জামা টাঙানো রয়েছে, "এখানে বিক্রীর জন্যে

নেড়ে চেড়ে দেখলাম জিনিষগুলো ভালো উনি বললেন- "এ ছাড়া আমাদের ওখানে মোটা কাজ হয় যেমন অনেক বাড়ী থেকে আট পৌরে ব্লাউজ; জামা; শেমিজ সব অর্ডার দিয়ে যায়। একদল মেয়ে শুধু ঐ নিয়েই ব্যস্ত থাকে।"

হেসে বললাম; "বলেন তো কয়েকটা সার্ট প্যাণ্টের অর্ডার দিই।"

"ঠাট্টা নয়, এখন একদিন দেখবে এসো না। সৌখিন রুমাল, টেবিলক্লথ, সব কিছু পাবে।"

"দামটাও বেশ সৌখিন করেছেন নিশ্চয়।"

"তা না করলে চলবে কেন প্রায় বিশটা মেয়ের জীবন এর উপর নির্ভর করছে।"

সুর পালটালাম, "আস্তে আস্তে আরো অনেকেই এর উপর নির্ভর করতে পারবে। আমার দিদি যখন এর মধ্যে আছেন।"

বাসনাদি বলেন, "আমাদের দেশে বিক্রীর ব্যবস্থা খুব খারাপ দোকানীকে অনেক টাকা না দিলে খদ্দেরকে জিনিষই দেখায় না।"

হয়তো বলেছি, "নিজেরা খুললেই হয়।"

"ইচ্ছে তো আছে সবই; কবে হবে জানি না।"

বাসনাদি নিজের মনেই বলেন।

মনে আছে তর্ক করে বলেছিলাম, "আপনার দেশের কাজ করা মানায় কত যায়গায় আপনি যান কত লোকের সংগে আপনার আলাপ যা চাইবেন তারা তাই দেবে।"

বাসনাদি হাসলেন, "এইখানেই বড় ভুল করলে এরা শুধু পার্টির বন্ধু এদের দিয়ে কাজ পাওয়া যায় না।

"তা আমি বিশ্বাস করি না।"

"বেশ তো এদের অনেককেই তো চেন, চেষ্টা করে দেখনা— বিশেষ কিছু নয় কয়েকটা ছেঁড়া কাপড় যোগাড় করতে পারো যদি।"

মেজাজটা চড়ে ছিল সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম কাপড় যোগাড় করতে। মিসেস্ ঘোষের বাড়ী আমার দাবী সবচেয়ে বেশী, তাই তাদের বাড়ী প্রথম গেলাম।

মাসীমা যেন আকাশ থেকে পড়লেন, "তুমিও শেষকালে বাসনাদির দলে নাকি?"

বললাম, "দোষ করেছি কিছু?"

"তা নয়, তবে আমাদের সাবধান হতে হবে তো; মাসীমা হাসবার চেষ্টা করলেন ধরো ইন্‌সিওরেন্সের দালাল দেখলে যেমন মানুষ চমকে ওঠে সেইরকম চ্যারিটি শোর টিকিট আর চাঁদার খাতা দেখলেও তো ভয় পেতে হয়।"

একটা ভালো কারণের জন্যে দুটো কাপড় কি কটা টাকা চাঁদা তুলতে যারাই আসে তারা তো সবাই ভালো কাজের দোহাই পাড়ে, কাকে দেব আর কাকে দেব না বলতে পারো? তোমরা বলবে সবাইকে দাও তাহলে আমরা ফতুর হয়ে যাবো। আমাদের জন্যে আবার চাঁদা তুলতে হবে।

অধৈর্য্য হয়ে বললাম তাহলে এদের কি হবে বলতে পারেন এই সব হতভাগার দল কে এদের দেখবে? আপনারা সিনেমা দেখতে গিয়ে একদিনে যা খরচ করেন-তা দিলেও-

মাসীমা ফোঁস করে ওঠেন, "এইখানেই তোমরা ভুল কর এদের দেখতে পারে একমাত্র গভর্ণমেণ্ট আমরা তার কি করব ? গভর্ণমেণ্ট এফিসিয়েণ্ট নয় বলেই আমাদের এ দুর্গতি।"

বুঝলাম সুবিধা করা যাবে না যখন কাউকে দোষ দেবার থাকে না তখন এদেশের লোক সব দোষটা চাপিয়ে দেয় গভর্ণমেণ্টের মাথায়- কারণ সেদিক থেকে তো আর প্রতিবাদ আসবে না। বেচারী গভর্ণমেণ্টের জন্যে দুঃখ হয়। এদেশের লোকের রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্বন্ধে টনটনে জ্ঞান কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতি তাদের যে কর্ত্তব্য আছে তা ভুলেও মনে করে না।"

সব মিসেস্‌দের কাছে একই জবাব পেলাম, যত দোষ সরকারের। তবে ওদের মধ্যে একজন বুদ্ধি দিয়েছিলেন, একটা চ্যারিটি শো করুন অনেক টাকা তুলে দেওয়া যাবে।" কথাটা মন্দ লাগেনি। বলেছিলাম, ভেবে দেখব। যখন উঠে আসছি উনি আমার কাণে কাণে শুনিয়ে দিলেন, "আমার মেয়ে খুব ভালো অভিনয় করে, অনেক ষ্টেজে করেছে, মেডেল পেয়েছে বললে হয়তো এ সময়টা পাওয়া যেতে পারে।"

ভাবলাম পুরোন পন্থীদের কাছে যাই হয়তো সুবিধা হতে পারে। পিসিমা খুড়িমার দল সিঁদুর মাখানো পোঁটলার সামিল মানুষের দুঃখ শুনলে চোখে জল আসে এঁদের।

সব কিছু বর্ণনা করে বললাম, "পিসিমা এই দুঃখের দিনে—"

"পিসিমা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন," সে তো দেখতেই পাচ্ছি বাবা, অথচ আমরা আর কি করতে পারি বলো।"

বললাম 'পুরোন কাপড় জামা যদি কিছু থাকে"

"এই যা কদিন আগে আসতে হয়—এই সেদিন একটা বাসনওয়ালাকে কাপড়গুলো দিয়ে মেয়েরা কতগুলি বাসন রাখলে—আগে জানলে—এর পর থেকে তোর জন্য রেখে দেব।"

পিসতুতো বোন তরকারী কুটছিল, সমর্থন করলে, "হাঁ এবার থেকে—তোমার জন্যে কাপড়গুলো বাধা থাকবে—তবে আমরা কজনই বা লোক—কটা কাপড়ই বা পুরোন হয়।"

আতিথেয়তার ক্রটি হয়নি—গরম গরম লুচি ভাজিয়ে পিসিমা খাইয়ে দিলেন—কড়া পাকের সন্দেশ। খেয়ে দেয়ে ওখান থেকে বেরুতে বেলা হয়ে গেল। সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছি, নজরে পড়লো খিড়কি দিয়ে এক বাসনওয়ালা ফিরে যাচ্ছে—পেছন থেকে কণ্ঠস্বর, "আজ এখন অসুবিধা আছে—সন্ধ্যেবেলা এসো।" শুনতে ভুল হয়নি—আমার পিসতুতো বোনের গলা।

এবারের বাস্তুহারাদের মধ্যে বাসনাদি সব চেয়ে বেশী কাজ করেছিলেন সলিলদের ক্যাম্পে—সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত বিশ্রাম নিতে দেখিনি—কতদিন বলেছি, "এভাবে খাটবেন না শরীর খারাপ হয়ে যাবে।"

উনি হাসতেন, "বয়স তো বাড়ছে—শরীর খারাপ হলে আর দোষ কি।"

স্বামিজীকে অনুরোধ করেছি—বাসনাদিকে বারণ করার

জন্য উনি বলেন, "ভায়া, তোমার কথায় যদি কাজ না হয়ে থাকে, আমি আর কি ক'রব বল। আমি যদি বলি, এ কাজটা ক'রনা, তবে তা দ্বিগুন ভাবে ক'রবে", একটু হেসে বলেন, "স্ত্রী স্বাধীনতা চেয়েছিলে, তার ফল ভোগ কর।"

মজা হ'ল, ক্যাম্পের লোকেরা জানে—এই একজনকে কিছু বললে, হয়তো কাজ হতে পারে, কারণ উনি সকলের কথা শোনেন—ছোট থেকে বড় কেউ বাদ যায় না—যে দুধ পায় নি, যার শরীর খারাপ, যার পরবার কাপড় নেই—সবাই একজনের কাছে আসে—সে বাসনাদি। যারা আমার মত স্বেচ্ছা-সেবক তারাও জানে—কোথায় গুঁড়ো দুধ ফুরিয়ে গেছে—ডাক্তারের ওষুধ নেই—চালের বস্তা ফুটো হয়েছে—সব নালিশ বাসনাদি।

সে দিন কি একটা দরকার ছিল, তাড়াতাড়ি সলিলদের ক্যাম্পে গেছি—বাসনাদির সঙ্গে দেখা করতে হবে। খবর পেলাম, কোনের ঘরে আছেন, ওখানে যাওয়া নিষেধ। সে কথা শুনলাম না, দরজা ভেজান ছিল, টোকা মারলাম, "বাসনাদি।"

বাসনাদি বেরিয়ে এলেন, সহজ গলায় জিগ্গেস করলেন, "কে বললে আমি এখানে আছি?"

বললাম, "দু'জন ভলান্টিয়ার—"

"তারা আর কিছু বলেনি—"

"আসতে বারণ করেছিল।"

বাসনাদি নীরস গলায় বললেন, "তাহলে তোমার আসা উচিত হয়নি।" বাসনাদির মুখ থেকে এ কথা শু'নব ভাবতেও পারিনি। লজ্জায় অপমানে সেখান থেকে চলে এলাম। কয়েকদিন বাসনাদির সংগে আর দেখা করতে পারিনি।

মনে আছে একটা ছোট ছেলে আমারই মত নিষেধ না শুনে ঐ ঘরে গিয়ে বাসনাদিকে ডেকে ছিল—উনি বেরিয়ে এসে তার কান ধরে বকেছিলেন—সেই একদিনই বাসনাদিকে কাউকে এভাবে অপমান করতে দেখেছিলাম।

এর কারণ কিছু খুঁজে পাইনি। জানতাম ওঘরে একটি মেয়ে তার শিশু সন্তানকে নিয়ে থাকে। কিন্তু সেজন্যে এত অধৈর্য্যের কি কারণ ?—সলিলকে একদিন জিগগেস করেছিলাম, "ও ঘরের কাছে গেলে বাসনাদি চটে যান কেন ?"

সলিল ব'লত, "কি করে ব'লব বলুন, উনি তো আর আমাকে বলে চটেন না।" তারপর কি যেন ভেবে হঠাৎ বলে, "বাসনাদির মাথাতেও স্ক্রু ঢিলে আছে নির্ঘাৎ জানবেন, তা না হলে এমন কেন হবে"।

ঐ সলিলই একদিন খবর দিয়ে গিয়েছিল, "ও ঘরে যে মেয়েটি থাকে তার বাচ্চা হয়েছে"।

বললাম, "তা তো জানি"।

সলিল ইতস্ততঃ করে, "না তা ঠিক নয়, মানে—অবাঞ্ছিত সন্তান"।

ঠিক বুঝতে পারলাম না—তাকিয়ে রইলাম—সলিল যা বললে, তাতে এই বোঝায়—মেয়েটির উপর অযথা অত্যাচারের ফল—এই অবাঞ্ছিত সন্তান—বিধবার জীবনে এক প্রচণ্ড আঘাত।

মেয়েটিকে একদিন দেখেছিলাম—ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছে—কেমন যেন উদাস দৃষ্টি—বেশ জোয়ান চেহারা—এক মাথা নোংরা চুল, সাদা থান পরা। একবার আমার দিকে তাকা'ল—সে দৃষ্টিতে কোন ভাষা নেই। বাসনাদি ঐ দিকে যাচ্ছিলেন আমাকে পথে দেখতে পেয়ে বললেন, "একটা বার্লির কৌট চট করে নিয়ে এস তো, আমি ওঘরে আছি।"

বার্লির কৌট নিয়ে যখন হাজির হলাম, ভেতর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ—ভাবছি টোকা দেব কিনা—বাসনাদির গলা শুনতে পেলাম, "আমার কথা শোন, বলছি তোমার ভালো হবে।"

উত্তরে শুধু কান্না আর চিৎকার, "না না তা কিছুতেই হবে না—এ আমি করতে দেব না"।

"ভগবান তোমার মংগল করবেন"।

মেয়েটি যেন ফেটে প'ড়ল, "ভগবান নেই, সে বেটা মরেছে—হাবা কালা বুড়ো।"

বার্লির কৌট দোর গলায় রেখে চলে এলাম। কেন জানিনা আর দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে হ'ল না।

সেদিন রাত্রিবেলা আমার ডিউটি-ছিল—পায়চারি করছিলাম—চারিদিক ঘুরে এসে আরাম কেদারায় শুয়ে আছি—জানি কারুর দরকার হলে আমার কাছে আসবে। তখন রাত্রি কত হবে জানিনা ঘুম ভেংগে গেল। দালানে একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ভাবলাম কি দরকার একবার জিগগেস করি। কিন্তু কিছু না করে চুপ করে বসে রইলাম, চিনলাম এ সেই কোনের ঘরের মেয়েটি অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে শিশি থেকে কি যেন ফেলে দেয়—অতি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসে কল থেকে জল ভরে।

ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না—পরদিন বাসনাদিকে জানালাম—সব কথা শুনে মুখ গম্ভীর হয়ে গেল, "জানতাম, এ আমি জানতাম।" কোনের ঘরে চলে গেলেন—খানিকবাদে সলিলের হাতে শিশি দিয়ে বলছেন শুনলাম, "ওষুধটা করে এনে দিতে বলতো—একটা বাচ্ছার ওষুধ বড় দরকারী।"

বাসনাদিকে রেগে যেতে দেখেছি মাঝে মাঝে। কিন্তু মিসেস্ ঘোষের বাড়ী যে ভাবে উত্তেজিত হয়েছিলেন তেমন আর কখন দেখিনি।

"সভ্যতার বড়াই আর করবেন না মিঃ ঘোষ, তার পরিচয় যথেষ্ট পেয়েছি।"

মিঃ ঘোষ বাধা দিতে গিয়েছিলেন, "এ আপনি অন্যায় বলছেন—"

"অন্যায়কে প্রশ্রয় আমি কখন দিইনি—আর একথা বলতেও যথেষ্ট কষ্ট পাচ্ছি," একটু হাসেন, "এখন মনে হয় জংগলের জন্তুগুলোও আমাদের চেয়ে ভালো—তারা খিদে পেলে জীব হত্যা করে অযথা নয়।"

মিসেস ঘোষ কি বলতে গিয়ে ধমক খান, "আপনাদের সভ্যতা—এই শহরের ড্রইংরুমের মধ্যে—তার বাইরে গেলেই মুখোস খসে পড়ে—কতখানি বর্বর হলে মানুষ নারীর জীবন নষ্ট করে দেয়—তার সামান্য ভোগ লালসার জন্য।"

মিঃ ঘোষ হাসেন, "এ তো চিরকালই চলে আসছে—নতুনত্ব কোথায়?"

"জানিনা চলে এসেছে কিনা, যদি এসেই থাকে—মনে রাখবেন এর চাইতে দুর্ভাগ্য আর কিছুতে নেই—ভাবুন দেখি একটি মেয়ের জীবন—তার ঘর বাড়ী ভেঙ্গে দেওয়া হয়—স্বামী পুত্রকে হত্যা করা হয়—সুখের সংসার ছারখার করা হয়—তার উপর চরম শাস্তি দেওয়া হয় তাকে অন্তঃস্বত্বা করে দিইয়ে—কারণ তার দোষ সে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভুক্ত।"

"সে কি," আমি চমকে উঠি।

"ঠিক তাই, পেটে তার ছেলে, অবাঞ্ছিত সন্তান। যে রক্তে সে অংকুরিত তা শয়তানের—তার শত্রুর, সে কি করবে বলতে পারেন?" সবাই চুপ করে যায়।

"এর পর মাথা ঠিক রাখা মুস্কিল হয়—" বাসনাদি তখনও বলে যান, "রুগ্ন সন্তান ভূমিষ্ঠ হল—মা তাকে স্নেহ করবে না

কি করবে—যতবার সেই মুখ দেখে—তার সুখের সংসারের কথা মনে পড়ে যায়—তখন কি তার ইচ্ছে হয় না 'এই শিশুর গলা টিপে মেরে ফেলি।' অথচ সেই নিষ্পাপ শিশুর কি দোষ ?"

সমস্ত আবহাওয়া থম থমে করে দিয়ে বাসনাদি বেরিয়ে গেলেন। চোখের সামনে কোনের ঘরের মেয়েটির ছবি ভেসে উঠল—আর তার ওষুধ ফেলে দেওয়া।

কদিন বাদের কথা—সবে মাত্র ক্যাম্পে হাজিরা দিয়েছি—বাসনাদি ধরে নিয়ে গেলেন কোনের ঘরে—মেয়েটিকে দেখলাম জানলার কাছে গোঁজ হয়ে বসে আছে—আমাদের বোধ হয় গ্রাহ্য ক'রলনা। অদূরে একটি শিশু ঘংঘং করে কাশছে—বাসনাদি এগিয়ে গেলেন, শিশিতে পুরো ওষুধ রয়েছে—এক ফোঁটাও বাচ্চার পেটে যায়নি, বাসনাদি ইংরাজীতে কথা বলেন, "এও এক রকমের হত্যা। এত অসুখের মধ্যে মা হয়েও ওষুধটুক পর্য্যন্ত দেয় না।"

বললাম, "এখানে ফেলে রেখে লাভ কি—বাচ্চাকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাওয়া উচিত।"

"সেইজন্যে তোমাকে নিয়ে এসেছি—ওকে নিয়ে চল, এখনি পাঠিয়ে দেব।"

বাচ্চাকে কোলে করে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম—মেয়েটি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল, একটি কথাও বললে না। বাসনাদি বোধহয় তাকে কিছু বলে এলেন—বাচ্চাকে হাঁসপাতালে পাঠান হল। দু'একদিন খোঁজ নিয়েছিলাম—

অবস্থা খুব আশংকাজনক, কারণ নাকি প্রথম বেলায় ওষুধ পড়েনি।

দিন কয়েক পরে কান্নার শব্দে মনটা খারাপ হয়ে গেল। খবর এসেছে বাচ্চাটি মারা গেছে—ভেবেছিলাম এবার মেয়েটি বোধ হয় মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলবে—কিন্তু তা নয়। ডুকরে কেঁদে উঠল। কোন উক্তি করল না।

বাসনাদি ম্লান হাসলেন, "একেই বলে মায়ের প্রাণ—যাকে দুচক্ষে দেখতে পা'রত না, আজ তারই জন্য কেঁদে আকুল।

আমি বুঝতে পারছি, এ লোক দেখানো চোখের জল নয়—সত্যিকারের কান্না।

মেয়েটি তিনদিন ভালো করে খায়নি, কেমন যেন ভ্যাবলা হয়ে থাকে—কথায় কথায় কেঁদে ফেলে, "নরকেও জায়গা হবে না আমার।"

বাসনাদি প্রত্যেকদিন সময় করে—তার সংগে গল্প করেন, "নতুন জীবন তোমায় সুরু করতে হবে, সম্পূর্ণ নতুন—"মেয়েটি মনে হয় কথা শোনেনা, চুপ করে থাকে। বাসনাদি আমায় বলেছিলেন, "যতই কাঁদুক এছাড়া এর মুক্তি ছিল না—এবার ও সহজ হয়ে উঠতে পারবে।"

কথাটা তখন খুব বিশ্বাস করিনি—কিন্তু একমাস পরে যখন দেখলাম, মেয়েটি পণ্ডিত মশাইএর সংগে পুতুল বিক্রী করছে—বুঝলাম বাসনাদির কথাই ঠিক। পণ্ডিত মশাই এর অতীতের কথা সব কিছুই শুনেছেন—জানিনা কার মুখ থেকে। মেয়েটির হাত দেখে বল্লেন, "এর জীবনের অনেক বাকি—খারাপ দিন কেটে গেছে—সত্যিকারের ভালো এইবার আসছে।" পণ্ডিতকে ভাল না বেসে কেউ পারে না—তাই বোধ হয় মেয়েটিও বেসেছিল—পণ্ডিতকে বাবা ডাকে, পূজা-আচ্ছায় তার মন এসেছে। পণ্ডিতকে একদিন জিগগেস করেছিলাম, "হিন্দু ঘরের বিধবার জীবনে আর কি সুখ আসতে পারে, পণ্ডিত মশাই?"

পণ্ডিত হাসলেন, "সে কথা তো ঠিকুজীতে লেখা থাকতে

পারে না—তবে এটা সত্যি এতদিন পর্য্যন্ত বড় দুঃখে মেয়েটির দিন কেটেছে।”

স্বীকার করলাম, “তাতো বটেই, সাম্প্রদায়িক দাংগায় ও ঘর সংসার সব কিছু হারিয়েছে—”

“শুধু সাম্প্রদায়িক দাংগা নয়,” পণ্ডিত প্রতিবাদ করেন, “তার আগেও এর জীবন খুব সুখের ছিলনা।”

আশ্চর্য্য হলাম, “সে কি রকম ?”

“ঠিক তাই, শ্বশুর বাড়ী তার জীবনে বিষের মত তেঁতো হয়ে উঠেছিল—স্বামী এবং শ্বশুরের ব্যবহারে। এখন সে অনেক সুখী—আরও সুখী হবে স্বাধীন ভাবে কাজ করে। বিনা পয়সায় দাসী গিরি করতে হবেনা—কথায় কথায় অপমান সহ্য করতে হবে না।”

সে দিন বাসনাদির বাড়ী গিয়ে দেখা হ'লনা। স্বামিজীর সংগে আলাপ করছিলাম। ভদ্রলোক দাড়ি কামিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। হেসে আপ্যায়ন করলেন, “এসো এসো কতদিন দেখা হয়নি। তোমাদের না দেখলে কি আর পুণ্য হয় ?”

“হঠাৎ,” অমায়িক হাসলাম।

“তোমরা হচ্ছ দেশের কর্মীবৃন্দ। আমার স্ত্রীর ডান হাত বিশেষ, তোমাদের দেখা পাওয়া কি কম ভাগ্যের কথা। তাহলে অন্তত এটুকু সান্ত্বনা পাব, যে স্ত্রীর টিকিটি না দেখতে পেলেও হাতটা তো দেখেছি।”

হাসলাম, "কেন বাসনাদির দেখা পান না বুঝি ?"

"কি করে পাব বল। তোমাদের মত এত বাণী শোনার লোক হয়েছে যে উনি মনে করেন আমাকে শুনিয়ে আর ওরকম সমঝদার পাওয়া যায় না। আজ ভোর বেলা উধাও হয়েছেন, ড্রাইভারকে ঘুম থেকে তুলে—আপিস যাওয়ার আগে হয়তো দেখা হবে নয়তো গাড়ী পাঠিয়ে দেবেন।"

কি মনে হল, বললাম, "আপনিও দেশের কাজে লেগে যান না।"

"প্ল্যানটা মন্দ বলনি ভায়া, ভাবছি কাজে ইস্তফা দিয়ে তোমার দিদির সংগেই লেগে যাই—বাণী দেওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে।"

বাচ্চার কান্না শুনে স্বামিজী উঠে গেলেন, "এই দেখ কাঁদে কেন আবার ?"

স্বামিজীর কথাবার্ত্তা বড় ভালো লাগে—দেখে মনে হয় না—নামজাদা ব্যবসাদার—সারাদিন ব্যবসা নিয়ে থাকেন। পাছে স্ত্রী মনে কষ্ট পান—তাই মনে আশংকা ছিল। বাসনাদিকে পেয়ে তিনি সুখী কারণ তিনিও বেশীক্ষণ বাড়ী থাকার সময় পান না।

একটু বাদে ফিরে এলেন, "এ এক নতুন সখ তোমার দিদির —ধকল পোয়াতে হচ্ছে বেচারী আমাকে, দিন পনের থেকে।"

"কি হল আবার", জিগ্গেস করলাম।

"একটি বাচ্চা মানুষ করছেন—মানুষের বাচ্চা পোষার সখ এই প্রথম শুনছি—"

হাসলাম, "সে আবার কি ?"

"আমাকে মিথ্যে জিগ্‌গেস করছ। কোন হাসপাতাল থেকে বুঝি একে উদ্ধার করেছেন—এতদিন সর্দি কাশীতে ভু'গল, এখন ভালো আছে।"

কথাটা কানে খট করে লাগল, "এর বাপ মা—?"

উত্তর দিলেন স্বামিজী, "ঠিক জানি না, বোধ হয় কেউ নেই—"

কতগুলো ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল—সেই কোনের ঘরের মেয়েটি—সর্দি ভরা তার বাচ্চা—আর বাসনাদির কথা,—"এ ছাড়া এর মুক্তি ছিল না এবার ও সহজ হয়ে উঠতে পারবে।"

হাসপাতালে খবর নিয়েছিলাম, বাচ্চাটি খালাস পেয়েছে দিন পনের আগে।

নমঃশূদ্রের দল—সার বেঁধে ষ্টীমারের টিকিট কাটছে—শুনেছিলাম এরা দেশের মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকতে চায়—তবে সবাই মিলে পালাচ্ছে কেন? কৌতূহল হ'ল।

চাঁদপুর ছাড়িয়ে পাশের গাঁয়ে গেলাম সেখানেও পালাই পালাই রব উঠেছে। এক বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা; সে এখনও দেশ ছাড়বে বলে মন করেনি। তাকেই জিগ্গেস করছিলাম—"এরা সব দেশ ছেড়ে যাচ্ছে কেন?"

"কি করবে বলুন" বৃদ্ধ পাল্টা প্রশ্ন করে।

"তোমাদের নিজেদের কোন ক্ষতি হয়েছে?"

"আজ্ঞে না,"

"তোমাদের গাঁয়ে ?"

আজ্ঞে না,"

"তবে ?"

বৃদ্ধের চোখে জল আসে, "তবে আর কি, নিজের ঘর বাড়ী ছেড়ে কি সাধ করে কেউ অন্য দেশে ভিক্ষে করতে যায় ?"

সব কথা হ'ল না, আমার সঙ্গে যে পুলিশ অফিসার ছিলেন, তিনি এসে পড়লেন, বৃদ্ধকে সাহস দিয়ে বলে এলাম "ভয় নেই, তোমরা থাক, তোমরা থাকলেই অনেকে থাকবে। পুলিশকে বলে যাচ্ছি দেখাশোনা করবে।"

ইতিমধ্যে দুটো জাহাজ ছেড়ে গেছে, তৃতীয় জাহাজের জন্যে লোক বোঝাই করছি—সার বেঁধে টিকিট কাটছে। কি আশ্চর্য্য দেখি সেই বৃদ্ধ টিকিট কাটতে এসেছে, কাছে গিয়ে জিগ্‌গেস করলাম।

"কি মোড়ল চললে নাকি ?"

বৃদ্ধ শুকনো হাসে, "হাঁ বাবু, আর থাকা গেল না। পাশের বাড়ীতে কদিন আগে চুরি হয়েছে। বড় সিঁদ কেটে যথাসর্বস্ব নিয়ে চলে গেছে। কে জানে এবার হয়ত আমারই পালা," একটু থেমে নিজের মনেই বলে, "সারাদিন এই আতংকের মধ্যে থাকা যায় না।"

জিগ্‌গেস করলাম, "পুলিশে খবর দিয়েছিলে ?"

"পুলিশ এসেছিল, চোরকেও হয়ত ধরবে, হয়ত কঠিন সাজা দেবে, কিন্তু যার যথাসর্বস্ব গেল, সে তো আর ফিরে পাবে না!" বৃদ্ধকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পেলাম না। সে কিন্তু থামে না, "বাবু রোগটাকে মানুষ ভয় করে, রোগ হলে পর ডাক্তার এসে দাওয়াই দেবে কিনা, তা জেনে আর লাভ কি, ভয়ে ভয়ে আধমরা হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে একেবারে মরা ঢের ভালো।"

কি ভেবে আশ্বাস দেবার চেষ্টা করলাম, "ধর যদি আবার দু'রাষ্ট্রে মিল হয় তোমরা আবার ঘরে ফিরে যেতে পারবে তো?"

"ঘর কোথায়? সে তো জলের দরে বিক্রী করে এসেছি। তার উপর ফি'রব কোন্ মুখে, দেশ ছেড়ে যাচ্ছি বলে কি অসহ্য টিটকিরি। লাঠির খোঁচা না খেলেও কথার খোঁচা কি সহ্য হবে!"

বৃদ্ধকে সংসার সমেত জাহাজে তুলে দিলাম। গৃহস্থ আজ যাযাবর।

পরেশবাবুদের মধ্যবিত্ত সংসার। নারায়ণগঞ্জ থেকে ষ্টীমার করে কলকাতায় যাচ্ছেন, সঙ্গে স্ত্রী, দুটি মেয়ে—শিক্ষিত রুচিকর জীবন। পরেশবাবু কোন ব্যাঙ্কের অফিসার। রিটায়ারের বয়স হয়েছে। বড় মেয়ে কলেজে পড়ে—নাম অনিলা। আলাপ হল—বড় মিষ্টি স্বভাব।

জিগ্‌গেস করছিলাম, "কলকাতায় গিয়ে কোথায় উঠবেন ?"

"প্রথমে মাসীমার বাড়ী, তারপর হয়তো অন্য ব্যবস্থা হবে", অনিলা স্পষ্ট উত্তর দেয়।

"ব্যবস্থা করা মুশ্‌কিল, যা বাড়ীর টানাটানি—!"

"জানি" অনিলা চুপ করে যায়।

বললাম, "পরেশবাবু বলছিলেন এখানে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর অসুবিধা—সত্যি ?"

অনিলা হেসে অনেক কথাই বলে, যা গুছিয়ে নিলে হয়তো দাঁড়ায়—এখানকার সমাজে পুরোপুরি পর্দা প্রথা। তাই যুবকেরা কোন যুবতীর দেখা পায়না;—যতদিন না বিয়ে হয়, অথচ তারা বিলিতি বই পড়ছে, সিনেমা দেখছে। অনিলা বলে, "বয়োধর্মের গুণে, আমাদের মত যারা খুব বেশী পর্দা মানে না, স্কুল কলেজে পড়ে—তাদেরই ওপর এদের নজর পড়ে—হয়তো—চিঠি লেখে, হয়তো দুটো কথা বলতে চায়।"

অনিলার কথা উড়িয়ে দিতে পারলাম না। সে ঠিকই বলেছে—ঐ একই জিনিষ কলকাতায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ঘটলে, হয়তো আমরা আখ্যা দিই প্রেম, কিন্তু এখানে একতরফা বলে তা প্রেম বলা চলে না, সকলের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। জিগ্‌গেস করলাম, "এ সমস্যা তো দেশ ভাগ হবার আগেও ছিল!"

অনিলা বেশ অভিজ্ঞের মত বলে, "ছিল না। কারণ আমাদের ভাইরা তখন এখানে পড়াশুনা ক'রত,

কিন্তু এখন ছেলেরা জানে—ভবিষ্যতের রাস্তা এখানে খুব বেশী খোলা নেই, তাই তারা কলকাতায় পড়তে যায়, যাতে পরে ওধারে চাকরী পেতে পরে। বাবারা ছেলেদের পাঠিয়ে দিয়ে এখানে ছিলেন, কিন্তু যদি মেয়েদেরও পাঠিয়ে দিতে হয়, তবে আর কাকে নিয়ে থাকবেন ?”

অনিলার কথাগুলো সেদিন বড় ভাল লেগেছিল, “জানেন এই বাঙ্গাল দেশেই মেয়েরা সবচেয়ে বেশী লেখাপড়া ক'রত !”

অনিলাদের জাহাজ চাঁদপুর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। বাড়ীর ঠিকানা দিয়ে বলেছিলাম, “কলকাতায় দরকার হলে খবর দেবেন।” অনিলা হেসে বলে, “খুব ভুল করলেন, কলকাতায় দেখা হলে হয়তো এত অভিযোগ জানাব যে মনে মনে ভাববেন, ঠিকানা না দিলেই ভাল হ'ত।”

ষ্টিমারের বাঁশি জোরে বেজে ওঠে। কোন কথা শোনা যায় না। ঘাটে নেমে এলাম—জাহাজ ছেড়ে দিল—দেখলাম ডেকের ওপর অনিলা আর পরেশবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। ষ্টিমার কোম্পানীর সাহেব এসে কাজের কথা সুরু করে দিলে—অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথা বলতে হ'ল। যখন আবার ফিরে তাকালাম—জাহাজ দূরে চলে গেছে।

বাঙ্গালী ঠাকুর নালিশ করতে এসেছে, “এ রকম হলে কাজ করতে পা'রব না বাবু।”

জিজ্ঞেস করলাম, “কি হয়েছে—?”

"সারাদিন খেটে ম'রব—ওরা কিছু করবে না—নিজদের এটোঁ বাসনগুলোও মাজ্‌বে না—সব আমাকে করতে হবে।"

এ অসহ্য। ঠাকুরদের ডেকে বিচার করতে বসলাম। প্রশ্নোত্তরে অনেক নতুন তথ্য জানলাম—আমার সঙ্গে কয়েকজন ঠাকুর ছিল, তার মধ্যে পাঁচজন বিহারী, তিনজন উড়ে, চারজন বাঙ্গালী। এখানে আসার ক'দিনের মধ্যে নাকি দু'ভাগ হয়ে যায়। বিহারী আর উড়ে আটজনে মিলে নিজেদের রান্না করে—ওদিকে চার জন বাঙ্গালী মাছের জন্য অন্য হেঁসেলে

রাঁধে। আজকের ঝগড়া শুধু বাঙ্গালী ঠাকুরদের মধ্যে, ওরা আবার দু'ভাগ হয়ে যেতে চায়।

রেগে বললাম, "এ সব আমি সহ্য ক'রবনা—এক রকম রান্না হবে, সবাই খাবে—তা যদি না পারো ষ্টিমার থেকে নেমে যাও—আর কলকাতা ফিরতে হবে না।" যতদূর বুঝলাম কালীপদ, যে বাঙ্গালী ঠাকুর নালিশ করতে এসেছিল, সেই ঘোটমংগলের রাজা।

ঐ দিনই অনিলাদের জাহাজ ছাড়ছিল—রাগের মাথায় কালীপদকে ওদের জাহাজেই তুলে দিলাম রান্নার কাজ করবার জন্যে।

মনে দুঃখ পেলাম। বাঙ্গলার ইতিহাসের কথা চোখের সামনে ভাস্‌ছে—শুধু ঝগড়ার ইতিহাস—মিল খুঁজে পাচ্ছি না।

কদিন বাদে অনিলার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিলাম—কলকাতা পৌঁছানর পর। অনেক কথা—তার মধ্যে এক লাইন "আপনার ঠাকুর কালীপদ আশ্চর্য্য কাজের লোক—অবিশ্রাম পরিশ্রম করে সকলের সুবিধা অসুবিধা দেখেছে।"

বোধ হয় কালীপদর কথাই ভাবছিলাম—মনে পড়ে গেল কে যেন বলেছিলেন—একজন বাঙ্গালী পৃথিবী জয় করতে পারে, দুজন মিল্‌লেই ঝগড়া—তিনজনের মধ্যে প্রলয়। অন্যদিকে একজন সাহেব অপদার্থ, দুজন সাহেব কর্মী—তিনজনে মিল্‌লে জগত জয় করবে নিশ্চয়ই। মনে হ'ল কথাটা বোধ হয় খুব মিথ্যে নয়।

কালবোশেখীর ঝড় আসছে—চারদিক থম্ থমে—ঝপ করে অন্ধকার নেমে আসে—মাঝিরা যে যার নৌকো নিয়ে তীরে ফিরে যায়—জাহাজগুলো একটানা বাঁশী বাজায়—সাবধান হবার সংকেত। আমার ষ্টিমার মাঝ নদীতে নোঙর করাছিল—সারেঙরা ভয় পায় তাই তাড়াতাড়ি নিয়ে যায় খালের মধ্যে-জেটিতে। একটু পরেই ঝড় এসে পড়ে, দুর্দাম গতি—এক এক ঝটকায় নদীর মাথায় চাটী মেরে যায়—উড়ুক্কু মাছের মত জল উড়তে থাকে। এ দৃশ্য আগে দেখবার বরাৎ হয়নি—মাঝিমল্লারদের চিৎকারে আতঙ্কের ভয়—মনে হয় হয়তো কয়েকটা লোক খসে গেছে—জলস্রোতের মধ্যে। গোঁ গোঁ শব্দ। সবচেয়ে বেশী ভয় লাগায় জাহাজের একঘেঁয়ে ভো ভো বাঁশী-তার সঙ্গে বিদ্যুতের চকমকি।

কেবিনের মধ্যে থেকে দেখতে বেশ ভালো লাগ্‌ছিল—মাঝে মাঝে কবিত্ব যে জাগেনি বললে মিথ্যে বলা হবে! হঠাৎ মনে পড়ল উদ্বাস্তুদের কথা। তারা তো এই জলের মধ্যে পড়ে আছে। সারা দিন প্রচণ্ড রোদের ঝাঁঝ—তা সহ্য করে এরা পড়ে থাকে জাহাজের অপেক্ষায়—হিমের মধ্যে রাত কাটাবার অভ্যাস এদের হয়ে গেছে—কিন্তু এই ঝড়ের প্রচণ্ডতা কি সহ্য করতে পারবে?

ঘণ্টা দু'য়েক বাদে ঝড় থেমে গেল—তীরে যাবার আমার হুকুম নেই—জেটী থেকে এই হতভাগাদের অবস্থা দেখছি। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে সবাই—কেউ ঢুকেছে ট্রেণের কামরার মধ্যে-

যারা জায়গা পায়নি, তারা ট্রেণের নীচে। অনেকে রয়েছে কাঠের ব্রীজের তলায়—চারদিকে হাড়িকুড়ি ছত্রাকার হয়ে পড়ে রয়েছে—অনেকের অর্ধেক রান্না হয়েছিল—ঝড়ে জলে নষ্ট হয়ে গেছে—জায়গাটাতে একটাও লোক নেই—শুধু ষ্টীমার কোম্পানীর ঘরের কাছে মশারির মধ্যে কারা যেন রয়েছে চারিদিকে মাদুর দিয়ে ঢাকা। আমার পাশে পুলিশ ছিল—জিগ্‌গেস করলাম, "ওখানে কারা এই ঝড়ের মধ্যে ?"

"ওদের মধ্যে পোয়াতি মেয়েছেলে আছে—তাই বোধ হয় পালাতে পারেনি।" পুলিশ উত্তর দেয়।

চমকে উঠলাম এই দুর্দিনের মধ্যে সন্তান প্রসব। কেমন যেন চিন্তাও বিকল হয়ে যায়। চুপচাপ বসে দেখ্‌ছি—কতক্ষণে আবার সব ফিরতে সুরু করে। হঠাৎ মনে হ'ল সেই কোনের মশারির মধ্যে থেকে একটি মেয়ে বেরিয়ে আসে—অতি সন্তর্পণে চারিদিকে চায়—কেউ কোথাও নেই—দ্রুত পায় জলের ধারে এসে পড়ে—পুলিশকে বললাম, "দেখতো ও কি চায় ?"

পুলিশ দেখে মেয়েটি চমকে উঠে—কি যেন কথাবার্তা হয়—শেষকালে মেয়েটি ভয় পেয়ে আবার ফিরে যায়। পুলিশের কাছে সব কথা শুনলাম।

মেয়েটি জলের কাছে এসেছিল—হাতে কিসের যেন পুঁটলি নিয়ে। পুলিশ জিজ্ঞাসা করে "তোমার হাতে কি ?"

মেয়েটি চমকে উঠে, জবাব দিতে পারে না। পুলিশ আরও এগিয়ে যায়—মেয়েটির কোল থেকে শিশু কেঁদে উঠে—সন্থজাত শিশুর কান্না। পুলিশেও কেমন যেন ভয় পায়—"তুমি ওকে জলে ফেলে দিতে চাচ্ছ?"

মেয়েটি জবাব দেয় না।

"কেন ওকে ফেলতে চাও?"

"জাহাজে যেতে দেবে না।" মেয়েটী কেঁদে ফেলে। সন্থজাত শিশুকে নিয়ে জাহাজে ওঠা মানা আছে—তা এরা জানে—শিশুর চেয়ে তার মায়ের শরীর আরও দুর্বল থাকে—এরা না যেতে পেলে সংসারের সবাইকে থেকে যেতে হয়—তা অসম্ভব। তাই সকলের মংগলের জন্য এখনও মায়া পড়েনি যার উপর সেই শিশুকে ত্যাগ করাই সকলের সিদ্ধান্ত।

কথা শুনে বুকের ভিতরটা তোলপাড় করে উ'ঠল—এও কি সম্ভব! "আবার ফিরে গেল যে?"

পুলিশ হাসে বড় করুণ হাসি, "কেন পালালো? আমি ওকে শুধু বলেছিলাম—যদি জলেই ফেলে দিতে চাও—আমাকে দাওনা আমি ওকে মানুষ করব। মেয়েটি আর কথা বলে না,—ভয়ে ভয়ে পালিয়ে গেল। দেখুন বাবু এতখানি অবিশ্বাস।"

চরম সত্য—কোন উত্তর দিতে পারলাম না। পুলিশকে দিয়ে বলে পঠালাম ভয় নেই, যত ছোট ছেলে হোক না কেন, তাকে নিয়ে জাহাজে যাবার বন্দোবস্ত করে দেব।

সারা রাত ঘুমতে পারলাম না—শিশু হত্যার ভয়ে এখানে বসে পাহারা দিচ্ছি—মনে ভাবছি মানুষ কোথায় নেমে গেলে বাঁচবার আশায় নিজের সন্তানকে হত্যা করে—কে জানে হয়তো এ চক্রান্তের কথা শিশুর মা জানে না—হয়তো জানে। পুলিশের হাতে এরা শিশুকে তুলে দিতে পারে না; পাছে আবার নতুন কালাপাহাড়ের সৃষ্টি হয়—পাছে আবার প্রতিহিংসা নেয়—তার চেয়ে জলে ফেলে দেওয়া ভালো—আর কোন আশঙ্কা থাকে না।

কেন জানি না ছবি ফুটে উঠল—কুন্তী এক শিশুকে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে—মনে প'ড়ল নদীর তীরে কর্ণ কুন্তীকে ভৎর্সনা করছে—কে জানে কলিযুগের কর্ণরা আবার বেড়ে উঠছে কিনা—অধিরথদের ঘরে।

তখনও ভোর হয়নি—জাহাজ ছেড়ে দিল কলকাতার উদ্দেশ্যে—আমার বন্দী জীবনের সমাপ্তি—বাস্তুহারাদের প্রাণে নতুন জীবনের আশা। মেয়েরা হুলুধ্বনি করে ওঠে—এ যাত্রা শুভ হ'ক।

সামনের ডেকে বসে ডাক্তারের সংগে গল্প করছিলাম—ষ্টীমার ছাড়ার সংগে সংগে এদের হর্ষধ্বনি ডাক্তারের অসহ্য মনে হয়—"ওঃ বেটাদের খুব আনন্দ—নিজেদের বাড়ীঘর ছেড়ে যাচ্ছিস্ তাতে আবার উলু উলু।"

উত্তর দিলাম না—বুঝলাম ডাক্তারের মনে লেগেছে—সে সত্যিই ভালো লোক। পূর্ব পাকিস্থানের সরকারী ডাক্তার—সীমান্ত পর্যন্ত আমাদের চিকিৎসা করার ভার এর উপর—যথেষ্ট ওষুধ নিয়ে সে এসেছে। বললে, "এ আপনাদের অন্যায়!"

জিগ্‌গেস করলাম "কেন?"

"কেন আবার? ষ্টীমার নিয়ে এদের নিতে এসেছেন—এরা ভাবছে পশ্চিমবঙ্গের ওরা অতিথি—মাগ্‌না খেতে পারে, ফ্রি যেতে পাবে, আবার ওখানে গিয়ে পড়লে নাকি জমি বাড়ী সব কিছু পাবে?"

"এ কথা কে বললে?"

"কে বললে জানিনা। তবে এদের মধ্যে খুব কমই সত্যিকারের ক্ষতিগ্রস্ত। বেশীর ভাগই এমন যারা নেমন্তন্ন পেয়ে না যেয়ে আর থাকতে পারছে না।"

কথাটা বিশ্বাস হ'ল না—চুপ করে গেলাম। ডাক্তার লোক ভালো, কিন্তু তার মনের মধ্যে কতগুলো ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে তা উপড়ে ফেলা যায় না—এ তার শিক্ষা, তার সংস্কার।

এই তো কদিন আগে ডাক্তারকে নিয়ে উদ্বাস্তুদের তদারক করছিলাম। ডাক্তার সবাইকে চলে যাবার কারণ জিগ্‌গেস করে। নানারকম উত্তর আসে—ডাক্তার বলে, "বেশীর ভাগ বানানো কথা। আমাদের সহানুভতি পাবার জন্যে নিজেদের দুঃখ বাড়িয়ে বলছে।"

এমনি সময় সতীশের সংগে দেখা—ওর বয়স বেশী নয়, বছর চোদ্দ হবে, ষ্টীমারের কাছে ঘোরাঘুরি করছিল। কবে জাহাজ ছাড়বে, কি বিলি ব্যবস্থা, তাই জানতে বুঝি তার আসা। শুনলাম সতীশের বাড়ীর সকলে এই ষ্টীমার ঘাটেই আছে জাহাজ ছাড়ার অপেক্ষায়।

ডাক্তারের চিরাচরিত প্রশ্ন, "নিজেদের দেশ ছেড়ে কেন যাচ্ছ ?"

উত্তরে সতীশ অনেক কথা বলে গেল—সে ভাবেনি ডাক্তার পাকিস্থানী। আমাদের দুজনেরই পরণে বিলিতি সাজ। খুব চাপা গলায় বলে, "জোর করে আমাদের ধর্ম পাল্টে দিয়েছে। ভয়ে ভয়ে নামাজ পড়তে হয়।"

গা জ্বলে উঠল, সতীশ চলে যাবার পর ডাক্তারকে বল্লাম, "বুঝতে পারছেন তো মানুষ কেন চলে যাচ্ছে ?"

ডাক্তার বলে. "এ সত্যি অন্যায়। জোর করে কারুর ধর্ম পাল্‌টানো উচিত নয়," একটু থেমে বলে, "কিন্তু এ কথাও সত্যি অনেক লোক আবার ইচ্ছে করে ধর্ম পাল্টিয়েছে—"

বল্‌লাম, "সে রকম লোক বেশী পাবেন না।"

"হয়তো তাই, তবে জানবেন কোন ধর্ম ভালো হলে, অনেক লোকই তা গ্রহণ করে। কজন মুসলমান ভারতে এসেছিল—কিন্তু আজ সংখ্যায় তারা কয়েক কোটি।"

কোন উত্তর দিইনি। মনে মনে ভাবলাম, মৃত্যুভয় দেখিয়ে ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করা আর শক্ত কি !

কিন্তু বেশ বুঝলাম—ডাক্তার মনে মনে বিশ্বাস করে ইসলামই জগতের একমাত্র ধর্ম। কথাপ্রসংগে প্রায়ই সে ধর্মের আলোচনা করে।

"ইসলামের রাজত্বে কোন দিন বিধর্মীর প্রতি খারাপ ব্যবহার হয়নি।"

বললাম "এ কথা তো সব ধর্মেই আছে।"

"থাকলেও কেউ মানে না—বিশেষ করে আপনারা হিন্দুরা—পরধর্মবিদ্বেষী—ইতিহাসে দেখবেন বৌদ্ধধর্মকে এ দেশে থেকে তাড়িয়ে তবে আপনারা ছেড়েছেন—কারণ আপনাদের সংগে তাদের মতে মেলেনি।"

বললাম, "আপনি ভুল করছেন—ভগবান বুদ্ধ আমাদের একজন অবতার—"

"সে কথা আপনারা মুখেই বলেন তাই বৌদ্ধদের কোন স্থান ছিল না হিন্দুস্থানে—তারা পালিয়ে গিয়েছিল পার্বত্য অঞ্চলে কিম্বা চীন, বর্মায় অথচ এদেশে সুদীর্ঘ মুসলমান রাজত্বের মধ্যে হিন্দুদের উপর সেরকম কোন অত্যাচার করা হয়নি।"

গা জ্বালা করে উঠেছিল, তাই বল্লাম, "আপনারা কি ইতিহাসকে মিথ্যা প্রমাণ করতে চান, অত্যাচারের নিষ্ঠুরতম প্রকাশ কি মুসলমান রাজত্বে দেখা যায়নি।"

ডাক্তার আবার হাসে, ইংরাজের লেখা মিথ্যে ইতিহাস পড়ে আপনি কথা বলছেন। তখন মুসলমান ছিল শাসক—তাই বুদ্ধিমান ইংরাজ তাদের লেখা ইতিহাসে ইসলাম শাসনকে কালো রং-এ রূপায়িত করেছে, যাতে হিন্দু প্রজারা সহজে ইংরাজের দিকে যায়। আর হ'লও তাই।"

ঠাকুর ডাকতে এসেছিল, উঠে গেলাম রান্নার সরঞ্জাম তদারক করতে। অব্যাহিত পেলাম এই অবাঞ্ছিত তর্কের হাত থেকে।

ডাক্তারের ধর্ম সম্বন্ধে এ দৃঢ় বিশ্বাস। শুধু ডাক্তার বলে নয়, অনেকের সঙ্গেই কথা বলে দেখেছি—এই একই কথার পুনরাবৃত্তি।

ডাক্তার চিকিৎসা করছে—সকাল থেকে অনেকে এসে জানিয়ে গেছে—কারুর সর্দি, কারুর কাশি, কারুর জ্বর। ডাক্তার একটা খাতা নিয়ে রুগীদের মধ্যে যায়—ডেকের উপর কয়েকশ' লোক পড়ে রয়েছে—এ যেন বড় লোকের বিলাসিনী মেয়ে ধোপার বাড়ী দেবার জন্যে এড়া কাপড় ছড়িয়ে রেখেছে ঘরের চারধারে, ডিঙি মেরে মেরে চলতে হয়, পাছে না কাউকে মাড়িয়ে ফেলি। এরই মধ্যে রুগী দেখা—ডাক্তার কিন্তু এ বিষয়ে তৎপর—নাড়ীটিপে খানিকক্ষণ দেখে তারপরই বাঁধাধরা প্রশ্ন "কি হয়েছে?" "কবে থেকে কামড়াচ্ছে?" "পায়খানা হয়েছিল?" "জিব্ দেখি, মাথাটা ধুয়ে ফেল, গায়ে কিছু চাপা দাও'—উত্তর শুনে খাতায় রুগীর নাম লিখে ওষুধের ব্যবস্থা করে। আমায় বলে, "ডাক্তার দেখলে এদের রোগ বাড়ে মশাই, কিছু না হলেও ওষুধ দিতে হবে, অন্ততঃ লাল, নীল, জল।"

হাসলাম, "তার উপর বিনা পয়সায় ডাক্তার—"

"সেই তো হয়েছে বিপদ, কেউ আর আমায় রেহাই দিতে চায় না।"

কোণের দিকে একটী ছোট মেয়ের জ্বর হয়েছিল, তাকে

দেখা হ'ল। গা বেশ গরম। বড্ড হাওয়া বইছে। ডাক্তার পরীক্ষা করে বল্লে, "একে কোন কেবিনে আলাদা করে রাখা উচিত।" জিগ্‌গেস করলাম, "কি হয়েছে ?"

ডাক্তার নীচু গলায় উত্তর দিলে, "বোধ হয় হাম, মারাত্মক কিছু নয়, তবে সাবধান হওয়া ভাল।"

মেয়েটিকে তার মা সমেত পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল ষ্টীমারের হস্‌পিটাল কামরায়।

ডাক্তার ঠিক বলেছিল বিনে পয়সার চিকিৎসার বিরাম নেই,—হরদম লোক আসছে, "আজ্ঞে শরীরটা কি রকম খারাপ লাগছে"—

ডাক্তার চোখ তুলে তাকায়, "কি হচ্ছে ?"

"কি জানি ? শরীরে খুব যুত পাচ্ছি না।"

"ওঃ", ডাক্তার কি যেন ভাবে, "এই নাও, এই বড়িটা খেয়ে ফেল," রুগী নমস্কার করে চলে যায়।

জিজ্ঞেস করলাম, "কি দিলেন ?"

কিছুই দেওয়া উচিত ছিলনা, তবু একটা এ্যাসপায়রিন ট্যাবলেট দিলাম।"

খেতে বসেছি—রুগীদের তাড়া। ডেকে বসে গল্প করছি—অসুখের খবর। রাত্রি বেলা শুতে যাওয়ার আগে, একজনের বমি, দু'জনের মাথাধরা। মাঝ রাতেও রেহাই নেই—তিন দিনের শিশু নিয়ে যে নতুন মা আমাদের সংগে

যাচ্ছে তার বুঝি ঘুম হচ্ছে না—ভোর রাতে সেই হস্‌পিটাল ঘরে রাখা মেয়েটির পেট মোচড় দিচ্ছে অথচ পায়খানার ব্যবস্থা নেই।

ডাক্তার বিনা বিরক্তিতে সকলের চিকিৎসা করে—ধৈর্য্য ধরে শুনে দরকারে অদরকারে ওষুধ দেয়—সবাই ডাক্তারকে প্রশংসা করে অথচ ডাক্তার বলে, "কাদের পেছুনে খাটছি, এদেশ ছেড়ে চলে গিয়ে এরা এদেশের নামেই গালাগাল দেবে।"

বলেছিলাম, "যদি এদের সম্বন্ধে এতটাই ঘেন্না আপনার মনে, তবে এমন দরদ দেখিয়ে চিকিৎসা করছেন কেন ?"

ডাক্তার ম্লান হাসে।

"উত্তর দিচ্ছেন না যে।"

"সে অনেক কথা, ব'লব এক সময়," ডাক্তার থেমে থেমে বলে, "হয়তো রাত্রি বেলা—"

রাত বাড়ছে—খাওয়া দাওয়া সেরে ষ্টীমারের ছাদে উঠে গেছি। সারেংএর ঘর—তার সামনে রেলিং দিয়ে ঘেরা অপরিসর জায়গা। জ্বলজ্বলে চাঁদ চারদিক সাদা করে দিয়েছে। জলে চকচকে রূপোলি আঁচল আর চাঁদের ছবি। হাওয়া বইছে—মিষ্টি জলো হাওয়া। উদ্বাস্তুর দল বোধহয় এতক্ষণে শুয়ে পড়েছে, চেঁচামেচি নেই। রেলিং ধরে বসালাম—এই রকম নরম সময় রাণীর কথা মনে পড়ে কেন জানিনা মনটা বেশ ভিজে যায়।

ডাক্তার এসে পাশে বসল—পকেট থেকে সিগারেট বার করে ধরায়। জানে আমি খাইনা, তাই আর অফার করে না। দু'জনেই চুপচাপ। মনে হ'ল ডাক্তার খুব আরাম করে সিগারেট টানছে, তারিয়ে তারিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে।

"শুনবেন, কেন এদের চিকিৎসা করি ?" ডাক্তার হঠাৎ কথা বলে।

"সেই জন্যেই তো বসে আছি," অনিচ্ছা সত্ত্বেও বললাম।

"সে বড় সুখের দিন", প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে ডাক্তার ফেলে আসা দিনের কথা বলে গেল। মধুর কাহিনী, মনে হ'ল ডাক্তার চলে গেছে সেই দিনগুলোর মধ্যে…বাগেরহাট সাবডিভিশনে তাদের বাড়ী। ছোট বেলায় তার দিন কেটেছে সুরেশের সংগে। সুরেশ ডাক্তারের চাইতে বড় হলেও সহপাঠি। এক সংগে স্কুলে পড়েছে—তারপর সুরেশ চলে যায় কলকাতায় ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে—ডাক্তার ঢোকে ঢাকার মেডিক্যাল স্কুলে। অনেকগুলো বছর কেটে যায়—ডাক্তার ডিগ্রী নিয়ে ফিরে আসে—নিজের গাঁয়ে রীতিমত প্র্যাক্‌টীস সুরু করে।

নতুন ডাক্তারের রোজগার না থাকলেও কল্ থাকে অনেক বেশী—জানাশোনা সব বাড়ীতেই যেতে হয়, বিনা পয়সার চিকিৎসা করতে হয়। সুরেশদের বাড়ী এই সময়ে তার নিত্য যাওয়া আসা—তার বাবাকে রোজ ইনজেকশন দিতে হ'ত। ছুটিতে বাড়ী এলে সুরেশ ডাক্তারকে কতদিন বলেছে, "রোজ

একবার করে খবর নিয়ে যাস—আমি থাকি না থাকি। বাবা বুড়ো হয়েছেন—দেখাশোনা করবার লোক নেই, তোর উপরেই ভরসা।”

উত্তরে ডাক্তার জানিয়েছে, “এ নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না, একেবারে হাতুড়ে হয়ে বেরুইনি। মোটামুটি চিকিৎসা করতে শিখেছি। ছোটবেলায় সারাদিনই তোদের বাড়ী থাক্‌তাম এখন আর একবার করে আসতে পা'রব না ?”

সেবার পূজোর সময় বিভূতিবাবুরা এসেছিলেন সুরেশদের বাড়ী। বিভূতিবাবু ওদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। পূজোর কদিন খুব হৈ হৈ করে কা'টল। ডাক্তার কোনদিন ছাড়া পায়নি। সুরেশ তাকে ধরে নিয়ে গেছে পিকনিক করতে। সুন্দরবনে শিকার করতে, পীর জীহন আলির দরগায় কুমীরকে মুরগী খাওয়াতে। বিভূতি বাবুরাও সঙ্গে থাকেন, তাঁর মেয়ে শান্তি, কলেজে লেখাপড়া না করলেও বিচারবুদ্ধি তার যথেষ্ট। বয়সের অনুপাতে বোধ হয় বেশী বোঝে।

ডাক্তারের সংগে তার রোজই দেখা হয়, আলাপ হয় অনেক বিষয়। সে বলে, “আপনাদের সমাজে যে পর্দা প্রথা—এ আপনার ভাল লাগে—?”

“না ভালো ঠিক লাগে না—তবে এতদিন চলে আসছে”.... ডাক্তার আম্‌তা আম্‌তা করে।

শান্তি জোর দিয়ে বলে, “ছি, ছি, আপনারা লেখাপড়া শিখেও যদি এখনও মেয়েদের পঙ্গু করে রাখেন—”

"আহা আমরা কি আর সহজে করে রাখি—সমাজের নিয়ম যে—"

"সমাজের নিয়ম কি আর বদলানো যায় না—?"

"বেশ মুস্কিল, কোরাণে বলে, ধর্মের অনুশাসন—বিনা প্রশ্নে মানতে হবে—তা যদি না পারো ইসলাম ধর্ম ছেড়ে দাও।" ডাক্তার গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, "এতে কি আমাদের কম অসুবিধা? মেয়েদের চিকিৎসা করতে হলে সংগে একজন নার্স কিম্বা সেই বাড়ীর বয়স্থাকে রাখতে হয়। রুগী থাকে মশারির মধ্যে আমরা মশারির বাইরে কানে যন্ত্র লাগিয়ে বসে থাকি। নার্স বা বাড়ীর অন্য কোন মহিলা ফরমাস মত ষ্টেথিস্‌কোপ বসায় রুগীর শরীরে।"

"তা কি করে সম্ভব!" শান্তি বিস্মিত হয়।

ডাক্তার হাসে, "তা না হলে আর এত রোগ কেন আমাদের সমাজের মেয়েদের মধ্যে। এরা পুষে রাখে হাজার রকম রোগ—অথচ লজ্জা কাটিয়ে চিকিৎসা করতে পারে না।"

ছুটি শেষ হতেই সুরেশ চলে গেল কলকাতায়। তার ক'দিন পরের কথা—প্রায় মাঝ রাত্তিরে—ডাক্তারের ডাক এলো সুরেশের বাড়ী থেকে—শান্তির নাকি নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। দু'একটা বড়ি দিয়ে সে রাতের মত তাকে সুস্থ করা হল বটে কিন্তু চিকিৎসার এইখানে শেষ নয়। খবর নিয়ে জানা গেল—এ ব্যাথা তার অনেক দিন ধরেই হয়, মাঝে মাঝে। তবে এ' কদিন রোজই নাকি দেখা দিচ্ছে। সহর

থেকে ডাক্তার এলো, প্রায় দিন পনেরর চিকিৎসাতে যখন বিশেষ ফল হল না, ঠিক হয় শান্তিকে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হবে।

অসুবিধার মধ্যে খুলনা থেকে ট্রেণ সার্ভিস তখন কিছুদিনের মত বন্ধ—তাই ষ্টীমার করে শান্তিকে গোয়ালন্দ নিয়ে যেতে হবে—সেখান থেকে ট্রেণে করে কলকাতা।

ষ্টীমারের প্রথম শ্রেণীর কেবিনে শান্তি আর তার খুড়িমা, পাশের কেবিনে বিভূতিবাবু আর ডাক্তার। বরিশাল থেকে ষ্টীমার ছাড়ল—এতদিন শান্তির শরীর যাও বা ভাল ছিল—ষ্টীমারে উঠে ব্যাথা বেশ বেড়ে গেল। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়—স্প্যাজিমিনডনের বড়ি প্রায়ই খাইয়ে দিতে হচ্ছে।

প্রথম রাত কেটে যায়। সকাল বেলা ডাক্তার বিছানায় বসে শান্তির নাড়ি দেখে—আজ কেমন লাগছে ?”

“ভালই,” শান্তি ম্লান হাসে।

ডাক্তার আরও অনেক রকম প্রশ্ন করে—শান্তি হয়তো জবাব দেয়, হয়তো দেয় না—সে ডাক্তারের দিকে চেয়ে থাকে—বড় অসহায় করুণ দৃষ্টি, ডাক্তার চোখ নামিয়ে নেয়। কিন্তু সেদিন যতবারই সে শান্তির কাছে আসে, দেখে সে নিষ্পলক দৃষ্টিতে তারই দিকে তাকিয়ে থাকে—কত কথাই বলতে চায়।

সেইদিনই রাত্রিবেলার কথা—কার ঠেলায় ডাক্তার উঠে বসে—শান্তির খুড়িমা—পাছে বিভূতিবাবুর ঘুম ভেংগে যায়—

চাপা গলায় বলেন, "শান্তি সারা রাত ঘুমোয়নি—ভ্যাবলার মত তাকিয়ে আছে, কথা বলছেনা—তুমি একবার চল।"

বালিশটা উঁচু করে ঠেসান দিয়ে শান্তি শুয়ে রয়েছে। চোখের কোণে রাত জাগার কালি। ডাক্তার গিয়ে কাছে বসে, "কি হয়েছে", কোন উত্তর পায় না। নাড়ির গতি চঞ্চল।

"আপনাকে অনেক কথা বলার আছে", শান্তির মুখে কথা শুনে ডাক্তার চমকে ওঠে, "আমার কাছে—কি বল ?"—নিজেকে সহজ করার চেষ্টা করে।

"অনেক কথা—সে কথা না বলা অবধি আমার শরীর সারবে না। এতদিন কাউকে বিশ্বাস করে বলতে পারিনি—আজ আপনাকে সব শুনতে হবে,—" শান্তি কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে বলে।

ডাক্তার বিস্মিত হয়—কি বলবে ভেবে পায় না—পিছু ফিরে তাকায়, খুড়িমা কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন।

শান্তি আবার বলে, "আপনাকে যতদিন দেখেছি, মনে হয়েছে আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি, প্রতিজ্ঞা করুন জীবনে কাউকে একথা বলবেন না—", শান্তি ডাক্তারের হাতের ওপর বাঁ হাতটা রাখে। ডাক্তার সম্মতি দেয়। শান্তি বলে গেল অনেক কথা—ডাক্তার সে কথা আমায় বলে নি, বলে, "মাপ করবেন, সে কথাগুলো বলতে পারব না—কারণ শান্তির কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ," একটু থেমে নিজের মনে বলে, "তার সেই করুণ কাহিনী, চোখের জল, আত্মবিশ্বাস যেন আমার জীবনে একটা নতুন পরিচ্ছেদ লিখে দিয়ে গেছে।" সব কথা বলে—ক্লান্ত শান্তি অনেকটা হাল্‌কা হয়ে শুয়ে পড়ে।

ডাক্তার কেবিন থেকে বেরিয়ে আসে—রেলিংয়ে ভর দিয়ে খুড়িমা দাঁড়িয়ে ছিলেন। ডাক্তারের নিজেকে যেন অপরাধী মনে হয়। খুড়িমা সহজভাবে জিগ্‌গেস করলেন, "শান্তি ঘুমিয়েছে,—"

সবে ভোর হচ্ছে। ডাক্তার রেলিং ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। খুড়িমা গিয়ে নিজের কেবিনে শুয়ে পড়েছেন।

নতুন প্রভাত—মন কিন্তু ভারাক্রান্ত। ডাক্তার বলে, "শান্তি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ঘুমুচ্ছে—বুঝলাম নিজেকে অস্বস্তির মধ্যে প্রবেশ করাচ্ছি।"

জিগ্‌গেস করলাম, "তারপর !"

"তারপরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত—শান্তি কলকাতায় চলে গেল—সেখান থেকে নিজের বাড়ী ভাগলপুর—এখন বুঝি শ্বশুর বাড়ীতে আছে পাটনায়," একটু থেমে নিজের মনেই বলে, "বোধ হয় আমিও তার কথার খেলাপ করিনি। এই উদ্বাস্তুদের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি নেই—তবু তাদের চিকিৎসা করি—শুধু শান্তির অনুরোধ রক্ষার জন্য।" ডাক্তার ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে—কেমন যেন হাসে, "কি জানি ভুল করছি কি না।"

ডাক্তারের সংগে যখন কেবিনে নেমে এলাম বেশ রাত হয়ে গেছে—প্রায় একটা হবে। মনটা স্বপ্নালু-চিন্তায় বিভোর। কেবিনের সামনে কে যেন দাঁড়িয়ে—চিনতে পারলাম। যে মেয়েটির হাম হয়েছে তার বাবা।

"ডাক্তারবাবু আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি—।" রুগী কাশছে, সর্দি জমেছে, ঘুম হচ্ছে না—অনেক কথা বলে গেল।

স্বপ্নরাজ্য থেকে যেন হঠাৎ বাস্তবে নেমে এসে কেমন সব অজানা অচেনা মনে হচ্ছে। মনে হয় বলে দিই—আজ

নয় কাল দেখা যাবে। কিন্তু তার আগেই ডাক্তার সম্মতি জানায়, "চলুন, আমি এখুনি যাচ্ছি।" ষ্টেথিসকোপ গলায় ঝুলিয়ে ডাক্তার চলে যায়।

খানিক বাদে ফিরে আসে, "মেয়েটির বেশ ঠাণ্ডা লেগেছে —ব্রংকো নিউমোনিয়ায় টার্ণ নিতে পারে!"

"তাই নাকি ?—"

"ঠিক নেই, কয়েকাটি এম, বি বড়ি দিয়ে দেখি"।

দেখলাম ডাক্তার বেশ চিন্তিত—এতক্ষণের মধুর গল্পের কথা বোধহয় মন থেকে উপে গেছে।

ষ্টীমার এগিয়ে চলেছে। নদীর দু'তীরে গাঁয়ের ভিতর থেকে মেয়ে পুরুষ বেরিয়ে আসে ষ্টীমার দেখতে—অবাক হয়ে তারা চেয়ে থাকে। হয়তো চীৎকার করে হাঁক দেয়, "কোথা থেকে গো ?" জাহাজের লোক উত্তর দেয়, "চাঁদপুর !"

ডাক্তার ক্ষেপে যায়, "জাহাজের লোকদের জবাব দিতে বারণ করুন—"

জিগ্‌গেস করলাম, "কেন ?"

"কেন আবার, সারা রাস্তায় আপনারা এই ভাবে আতঙ্ক ছড়াতে ছড়াতে যাবেন। এই সব গাঁয়ের শান্তিপ্রিয় মানুষ— এরা চোখের সামনে দেখবে হাজার হাজার উদ্বাস্তু জাহাজ করে কলকাতা যাচ্ছে, এরা কি ভাববে না তাহলে বোধ হয় হিন্দুরা

আর বেঁচে নেই পাকিস্থানে! ভয়ে ভয়ে এরাও ঘর-বাড়ী ছেড়ে হেঁটে পাড়ি দেবে আপনাদের রাজ্যের দিকে।"

কথাটা মিথ্যে নয়—তাই জাহাজের লোকদের উত্তর দিতে বারণ করলাম।

কি মনে হয়, হঠাৎ প্রশ্ন করি, "কি দরকার ছিল এই রাজ্যভাগের—এক রাজ্যের মানুষ হয়ে কি আমরা আরও সুখে থাকতে পারতাম না?"

ডাক্তার বেশ জোর দিয়ে উত্তর দেয়, "মোটেই না আজ স্বাধীন রাজ্য পেয়ে আমরা কত সুযোগ সুবিধা পেয়েছি—আমি সরকারী ডাক্তার—এ কি আমি কোনদিন আশা করতে পারতাম—যুক্তরাজ্যে!" একটু থেমে আবার বলে, "সার্থক কোয়াদে আজমের সৃষ্টি এই ঐশ্লামিক রাষ্ট্র—যে জাতকে আপনারা অধঃপতিত নির্যাতিত বলে জানতেন, সে জাত এবার মাথা তুলে দাঁড়াবে।" ডাক্তার প্রত্যেকটি কথা অযথা জোর দিয়ে বলে।

ডাক্তার এমনি জোর দিয়ে কথা বলে তর্ক করার সময়। সে বলে, "ঐশ্লামিক রাষ্ট্র শুনে এখানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভয় পায়, কিন্তু তারা বোঝে না ঐশ্লামিক রাষ্ট্রে সংখ্যালঘুদের অধিকার অক্ষুন্ন থাকবে।"

বললাম, "কি করে বিশ্বাস করবে বলুন—ইতিহাসে তো—"

"ইতিহাসে প্রমাণ আছে, বৈকি—ঔরংগজেব তো সম্পূর্ণ ঐশ্লামিক মতে রাজ্য শাসন করেছেন—"

"সে তো খুব সুখের হয়নি—"

ডাক্তার হাসে, "ইংরেজের লেখা মিথ্যে ইতিহাস পড়ে ঔরংগ্‌জেবকে ভুল বুঝবেন না। ঔরংগ্‌জেব আকবর কি শাজাহানের মত প্রজার পয়সা অপব্যয় করেননি—নিজে টুপি তৈরী করে দিন গুজরাণ করেছেন—"

চটে গিয়েছিলাম, "সেইজন্য বৃদ্ধ পিতাকে—"

"যে পিতা ঐশ্লামিক মত মানেন না—ভোগ বিলাসে মত্ত থাকেন—তাঁকে বন্দী করা তাঁর কর্তব্য—ঐ একই কারণে ভাইদেরও হত্যা করা হয়।"

জিগ্‌গেস করলাম, "হিন্দুরা কি ভালো ব্যবহার পেয়েছিল সম্রাটের কাছে?"

ডাক্তার বুঝিয়ে দেয়, "হিন্দু-মুসলমান সমান অধিকার পেয়েছে—কম বেশী নয়। যে রাষ্ট্রের অনুশাসন মানে না, তার উপরই জিজিয়া কর বসান হয়েছে। বেশীর ভাগ সময় তিনি দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজ্যগুলির সংগে যুদ্ধ করেছেন—কৈ হিন্দুদের সংগে তো তেমন করেন নি!"

নতুন ইতিহাস শুনলাম—আকবরের চেয়ে ঔরংগ্‌জেব বড়—শিক্ষিত পাকিস্থানী সকলেরই এ দৃঢ় বিশ্বাস।

খুলনা থেকে জাহাজ ছাড়ে—বেলা গড়িয়ে এসেছে, এ রাজ্যের সীমানা পৌঁছুতে অনেক দেরী—সেইখানেই নামিয়ে দেওয়া হবে এ রাজ্যের ডাক্তার, ফৌজ আর কাষ্টম্‌স অফিসারকে।

যে মেয়েটির হাম হয়েছিল তার শরীর বেশ খারাপ। একবার ডাক্তার বলেছিল—খুলনার হাসপাতালে নামিয়ে দিয়ে গেলে ভালো হয়, কিন্তু তার বাপ-মা শোনেনি। ভগবান যা হয় করবেন—এখানে তারা ফেলে যেতে নারাজ।

সুন্দরবনের মধ্যে দিয়ে জাহাজ চলছে—রূপসার বাঁক পেরিয়ে রাইমংগল—নোনা জলের নদী, সারেংরা বলে এখানে অনেক কুমীর আছে। জাহাজ থেকে দেখলে মনে হয় বনের মধ্যে সূর্য্যের আলো ঢোকে না। দুর্ভেদ্য গহণ বন।

রাত ন'টা—ডেকের উপর দাঁড়িয়ে দেখছি—ষ্টীমারের আলো বনের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে—আশা করছি হঠাৎ যদি কোন

বন্যজন্তু চোখে পড়ে। ডাক্তার আসে, খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে, হঠাৎ বলে, "না ভুল করলাম, মেয়েটাকে খুলনায় নামিয়ে দেওয়া উচিত ছিল।"

"কেন অসুখ বেড়েছে নাকি—"

"বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে," বলেই ডাক্তার চলে যায়। আমিও তার পেছু পেছু গেলাম হস্‌পিটাল ঘরে। মেয়েটির শরীর খারাপ সন্দেহ নেই, বড্ড কষ্ট হচ্ছে, নিঃশ্বাস নিতে-গিয়ে হাঁপ ধরে, ডাক্তার নিজের মনেই বলে, "এদের কথা না শোনাই উচিত ছিল।"

রাত চারটে পর্য্যন্ত ডাক্তার আপ্রাণ চেষ্টা করে—তার যতখানি বিদ্যে, যা সামান্য অষুধপত্র—সব কিছু দিয়েও সে সুবিধা করতে পারে না মেয়েটির অবস্থা ক্রমশই খারাপ হয়। ভোররাত্রে সে মারা গেল।

সারা জাহাজে থমথমে ভাব—কিসের যেন আতংক। সদ্য মৃত্যুর কালো ছায়া জমাট হয়ে নেমে এসেছে প্রত্যেকের মনে। নিয়মমত মৃতদেহ জলে ফেলে দেবার কথা—বাবা মা এসে কেঁদে পড়ে, "বাবু ঘর, বাড়ী, মেয়ে সবইতো গেল, শেষ সৎকারটুকুও কি করতে পা'রবনা ?"

যুক্তি নেই, আছে সেন্টিমেণ্ট। আঘাত করতে পরলাম না। কাছের বন্য গাঁয়ে মেয়েটিকে নামিয়ে দেওয়া হ'ল তার সৎকারের জন্য। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা জাহাজ আটকে রইল। তীরে দাহ করা হচ্ছে, কতগুলো মানুষের সমবায় চেষ্টা—আগুন জ্বলে ওঠে—লেলিহান শিখা।

ডাক্তারকে খুঁজে পেলাম না। জাহাজে ফিরে এলাম—কানে এলো টুকরো কথা—অনেকে বলাবলি করছে, "তখনই বলেছিলাম ও ডাক্তারের ওষুধ না খেতে, তা হ'লে আর এ দুর্ঘটনা ঘটত না, এরা কখন আমাদের ভালো করে ?"

জাহাজের উপর সেই সারেং-এর ঘরের সামনে ডাক্তার বসেছিল। আমি গিয়ে পাশে বসলাম, এইখানে বসেই সেদিন ডাক্তার শান্তির কথা বলেছিল—দেখলাম তীরে চিতা জ্বলছে, ডাক্তার সেই দিকে তাকিয়ে—কতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম জানি না। ডাক্তার আস্তে আমার হাতটা টেনে নেয়। অদ্ভুত গলায় বলে, "আপনি আমাকে অবিশ্বাস করবেন না।"

"একথা কেন," আমি সহানুভূতি প্রকাশ করি। ডাক্তার উদাসভাবে বলে, "জানি এরা কেউ আমায় বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সত্যি বলছি একে বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা আমি করেছি, কিন্তু পারলামনা।"

বললাম, "আমি জানি এ নিয়ে অপনি মন খারাপ করবেন না।"

ডাক্তার ভেংগে পড়ে, "কিন্তু এরা আমাকে অবিশ্বাস করবে, তার কি হবে ?"

এ জিজ্ঞাসার কি উত্তর দেব ? অবিশ্বাস—চিতার আগুনের মত অবিশ্বাসের আগুন সারা দেশকে পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে।

ষ্টীমার ছেড়ে দিল—তখনও চিতা জ্বলছে, তাকিয়ে রইলাম—রাজ্যের সীমান্তে এসে ডাক্তার নেমে যায়—ব্যথিত মুখচ্ছবি—ষ্টিমার সামনে এগিয়ে চলে—তবু ভুলতে পারি না সেই অনির্বাণ চিতা, যা জ্বলছে—সারা দেশ জুড়ে, যা জ্বলবে অনাগত ভবিষ্যতে।

এ আগুনের মধ্যে মানুষ মানুষের মত বাঁচতে পারে না—যতই তাকে উৎসাহ দেওয়া হ'ক—যতই প্যাক্ট করা হ'ক—এ আগুন কে নেভাবে ?…

ডায়মণ্ডহারবারের অকূল জলরাশি পেছনে ফেলে ষ্টীমার ঢোকে অপরিসর ঘোলা জলের মধ্যে—এই গঙ্গা—পবিত্রতার প্রতীক—যাত্রীরা আবার হুলুধ্বনি দেয়—সুনির্মল আনন্দোচ্ছ্বাস—শুভযাত্রা সমাপ্তির পথে।

নজরে পড়ে চটকলের চিমনী আর ধোঁয়া আর কোয়ার্টার্স। বাংলা ও বাংগালীকে শোষণ করা কৌশলী ব্যবসাদারের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। কেন জানি না বাংগালীর জন্য অনুকম্পা হয়।

ঐ ফোর্ট উইলিয়াম দেখা যাচ্ছে—সমস্ত গংগার বুকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছে বিদেশীদের জাহাজ—মাল নিয়ে যায়—এরই জন্যে কলকাতার এত সম্মান। সম্পূর্ণ নতুন জীবনের আশা উদ্বাস্তুদের মনে—ত্রিশ দিন বাইরে থেকে আমিও অনেক আশা নিয়ে এসেছি।

কঠিন বাস্তব। কল্পনা ছিঁড়ে গেল শালিমার ঘাটে। কোথায় সহানুভূতি—এখানেও কর্তব্য। কলকাতায় জানাশুনা যাদের কেউ নেই সেখান থেকেই ট্রেণে চড়িয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বাংলার বাইরে। একটা 'আহাও' কেউ করেনা—এই শেকড় ছেঁড়া জীবনগুলোকে কোথায় পুঁতবে?

শুনলাম—"আবার ফিরে যাও" রব উঠেছে—দিল্লী আর করাচীর প্রতিনিধিরা বাংলার ভাগ্য নির্ণয় করেছেন। দিল্লী-চুক্তি—এ নাকি ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনা—সরকারী রেডিয়ো পায়রার মত বকম্ বকম্ করে—কাগজে বড় বড় বাংগালী নেতাদের ছবি—তাঁদের সুদীর্ঘ সমর্থন বক্তৃতা।

যে মেয়েটি মারা গিয়েছিল তার বাবা এসে সামনে দাঁড়ায়—"বাবু এখন আমরা কোথায় যা'ব?" সহজে উত্তর দিতে পারিনি—এ জিজ্ঞাসার কি উত্তর দেব?" শুধু বলেছিলাম "ঈশ্বর জানেন।"

কোন্ মুখে এই সর্বহারা, শোকসন্তপ্ত ব্যর্থ জীবনকে ব'লব "তুমি আবার ফিরে যাও। কারণ রাজধানীতে বসে আমাদের ভাগ্যবিধাতা তোমাদের মংগলের জন্য চুক্তি করেছেন।"

বাড়ী এসে এক তাড়া চিঠি পেলাম। তারি মধ্যে অনিলার চিঠি, "ঠিকানা দিয়েছিলেন তাই ব্যস্ত করছি। জানিনা ফিরেছেন কিনা—একবার দেখা করবেন।"

দু'এক দিনের মধ্যেই গিয়েছিলাম অনিলার মাসিমার বাড়ী। বড় না হলেও ছোট নয় মোটেই—নীচের তালার ঘরে

অনিলারা রয়েছে। তারা পাঁচজন। আলাপ জমে উঠল; দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগের কথা। এক সময় লক্ষ্য করলাম ঘরে আমি, অনিলা আর তার ছোট বোন ছাড়া কেউ নেই। অনিলা চাপা গলায় বললে "আপনার অপেক্ষাতেই ছিলাম। একটা থাকবার জায়গা ঠিক করে দিন।" গম্ভীর হয়ে গেলাম। "ওইটাই প্রবলেম, তবুতো আপনাদের থাকবার একটা জায়গা রয়েছে—অন্যদের কথা ভাবুন দেখি?"

অনিলা ইতস্ততঃ করে "একটা বাসা দেখুন যত ছোটই হ'ক, যেখানেই হ'ক।" একটু থেমে আবার বলে "মাসিমার এখানে আর থাকা বোধহয় অসম্ভব।"

কেন জানিনা জিজ্ঞেস করলাম—"আপন মাসিমা?"

অনিলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে "জানতাম তাই, ঢাকায় এলে মাসিমারা বতদিন আমাদের বাড়ীতে থেকেছেন—আমরাও এসে এখানে থেকে গেছি। আজ সবই যেন পাল্টে গেছে।"

"বেশ, চেষ্টা ক'রব।"

"আমাদের তো চেনাশোনা আর কেউ নেই," একটি কথায় অনিলা জানিয়ে দেয় সে চিরন্তন মেয়ে।

অনেক চেষ্টা করেও বাড়ী যোগাড় করতে পারিনি—যেখানে থাকা যায় সেখানকার ভাড়া খুব বেশী—যেখানে ভাড়া দেওয়া যায় সেখানে থাকা যায় না—চিরকেলে সমস্যা।

খবর পেলাম অমূক অঞ্চলে বুঝি সাবেকী আমলের কোন এক সাহেবের বাড়ী খালি পড়ে আছে। সময় নষ্ট না করে গিয়ে হাজির—একতলা বাংলো—বড় বড় পাঁচখানা কামরা—ইতিমধ্যে তিনখানা এক উদ্বাস্তু সংসার দখল করে বসেছে। বাকি দুটি ঘর—তবে বেশ বড়—তখনই অনিলাদের জন্যে দখল করে নিলাম—মাথার ছাদ আস্ত নয়; অনেক তালি দিতে হবে। মিস্ত্রি ডেকে লোক লাগিয়ে—এক সপ্তাহের মধ্যে জায়গাটা থাকবার উপযোগী করে তোলা গেল। হাট-বাজার সবই কাছে তবে কলকাতা থেকে একটু দূরে এই যা। পরেশবাবু হাত দুটি ধরে বলেছিলেন, "তুমি যে আমাদের কত আপনার—নিজের আত্মীয়রা এই বিপদে—এতটুকু সাহায্য করলে না অথচ,—" মামুলী কথা। অনিলা কিন্তু এধার দিয়েও গেল না—সে বলে "এ আমি জানতাম। কিন্তু এইখানেই আপনাকে জ্বালাতনের শেষ নয়—একটা চাকরী করে দিতে হবে।"

"কাকে ?"

অনিলা ম্লান হাসে, "আমাকে বাবা তো কিছু একটা করবেনই—আমিও করতে চাই।"

কি আশ্চর্য্য ধারনা—চাইলেই কি চাকরী পাওয়া যায় ? তবু তাকে নিরাশ করতে ইচ্ছে হ'ল না।

খবর পেলাম মাগ্‌না খেতে দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে—তানা হলে নাকি দিল্লী চুক্তিকে সফল করা যাচ্ছে না—বিনাপয়সায়

খাওয়ার লোভেই বুঝি—নিজেদের ঘর বাড়ী ছেড়ে সব চলে আসছে? অথচ কি ভয়ানক কথা এতগুলো প্রাণীর কি হবে? সেকথা কেউ ভাবে না—পিঁপড়ের মত মরে যাবে—হয়তো বাধ্য হয়ে ফিরতে হবে দেশে—তবেই বুঝি জোর গলায় বলা যাবে হাজার হাজার উদ্বাস্তু আবার ফিরে যাচ্ছে।

সেদিন অনিলাদের বাড়ী গেলাম—প্রায় একসপ্তাহ পরে। ভেবেছিলাম অভাব আর অভিযোগের তালিকা শুনতে হবে ভূরি ভূরি। কিন্তু আশ্চর্য্য সুখবর—পরেশবাবু যে বিদেশী ফার্মে কাজ করতেন তারা নাকি ওনার কাজে বরাবরই খুসী ছিল তাই পূর্ববংগ থেকে পশ্চিম বংগে চাকরী ট্রান্সফার করে দিয়েছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। হঠাৎ ঝড় ওঠে—বিপুল ঝড় আর বৃষ্টি। পরেশবাবু বলে গেলেন, "এ ঝড়ের মধ্যে তুমি ফিরতে পারবে না, কোথায় কি বিপদ হয়—"

"আপনি চিন্তা করছেন মিছামিছি—সংগে গাড়ী আছে—"

"তাহলেও কিছু বলা যায় না, যা গাছপালা ভাংগছে।"

অনিলা হাসে, "তুমি পাগল হয়েছ বাবা? এই জল-ঝড়ে আমিই বা ওঁকে ছেড়ে দেব কেন?"

অতএব আর যাওয়া হ'ল না। যতক্ষণ ঝড় চলল—বসে বসে গল্প করেছি। মাঝে মাঝে ফুটো ছাদ দিয়ে জল পড়ছে—বালতি রেখে জল যাতে না ছিটকায় আর ব্যবস্থা করেছি। কথায় কথায় অনিলা বলে, "আরও একটা ভাল খবর আছে।"

"কি রকম?"

"রোজগারের পথ পেয়েছি—এই বাড়ীর পাশের ঘরে যারা থাকে—তারাই ব্যবস্থা করে দিয়েছে।"

হাসলাম, "খুব ভাল কথা—এবার থেকে বোধ হয় আর আমার দরকার হবে না।"

অনিলাও হি হি করে হাসে। বুঝতে পারি ও বলতে চায়, "আপনিও ছাপমারা পুরুষ মানুষ, ব্যতিক্রম নেই"

রাত বেড়ে চলেছে, অথচ ঝড় থামার নাম নেই। আমি আর অনিলা বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। বিদ্যুতের আলোয় মাঝে মাঝে মনে হয় পাগলা ঝড় শব্দ করে হাসে—গাছগুলোকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করে—মাঠের ওপর ছড়ানো উদ্বাস্তুদের টালীর ঘরে ঘুসি মারে—এক এক চাঁটায় ছিটকিয়ে দেয় টিনের চাল—তুমড়ে দেয় সাময়িক বাসস্থান। অনিলার চোখে জল আসে, এ হতভাগাদের কি হবে?"

আবার সেই চিরন্তন জিজ্ঞাসা—যার কোন উত্তর নেই।

আরও কদিন বাদে অনিলাদের বাড়ী গিয়েছিলাম, কেমন যেম থমথমে ভাব। বিনা ভূমিকায় সে বলে, "এ ক'দিন কেন আসেন নি?,,

কি উত্তর দেব ভাবছিলাম। অনিলা অযথা ব্যস্ত হয়, "এখান থেকে আমাদের নিয়ে চলুন।"

জিগ্‌গেস করলাম, "কেন কি হয়েছে?"

"পাশের ঘরে যারা থাকে তাদের সংগে বাস করা অসম্ভব।"

অনিলা অনেক কথাই বলে গেল—ওদের সংসারে বুড়িমা, অসুস্থ বড় ছেলে, এক মেয়ে, আরও বুঝি দু-একটি নাবালক ছেলে। মেয়েটির নাম সরযূ—অনিলারই সমবয়সী। প্রথমে তারই সংগে আলাপ হয়। তারাও উদ্বাস্তু—অবস্থা খারাপ। তবে সে দেখে মাঝে মাঝে গাড়ী এসে সরযূকে নিয়ে যেতো। একদিন অনিলা জিগ্‌গেস করে, "আপনি রোজ কোথায় যান—"

সরযূ বলে, "উদ্বাস্তুদের সেবা করতে, আমি স্বেচ্ছাসেবিকা।"

সে প্রায়ই এসে গল্প করে দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী—একদিন বলেছিল, "আপনি লেখাপড়া শিখেছেন। চলুন না স্বেচ্ছা-সেবিকা হবেন—দশজনের উপকার করতে পারবেন, কিছু টাকাও রোজগার হবে—"

অনিলা তাতে রাজী হয়।

শেয়ালদার কাছাকাছি কোথাও বুঝি তাদের অফিস। সরযূর সুপারিশে অনিলার নাম ঠিকানা লিখে নেওয়া হয়। এই নারী প্রতিষ্ঠানের শাখা নাকি আছে—বিহার, যুক্তপ্রদেশ, বম্বে সব জায়গায়—প্রতিষ্ঠাতা অবাংগলী হলেও সদাশয় ব্যক্তি—দুঃস্থ নারীদের খুব সাহায্য করছেন। অনিলাদের কাজ হ'ল উদ্বাস্তুদের মধ্যে গিয়ে যে মেয়েরা কাজ করতে চায় তাদের নিয়ে আসা। ইতিমধ্যে অনেকগুলি মেয়ে সেখানে

জড় হয়েছে—বিবাহিত, অবিবাহিত নানা বয়সের। সেলাই-এর কাজ শেখানো হয় তবে খুব বেশী নয়।

পরের দিন জনবিশেক মেয়েকে যুক্ত-প্রদেশে পাঠানোর কথা। সেখানকার অপিস থেকে চেয়ে পাঠিয়েছে। ওখানে কুটির-শিল্পের বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। দুঃস্থ মেয়েদের কাজে লাগানো হবে।

অনিলা দেখে স্বেচ্ছাসেবিকারা মেয়েদের শক্ত হবার জন্যে উৎসাহ দেয়, "সেখানে তোমরা অনেক সুখে থাকবে। এদেশে আর তোমাদের কি আকর্ষণ আছে?" মেয়েরা হয়তো কাঁদে, সরযূরা বলে, "ভয় কি মাসে মাসে আমরাও তো যাবো।"

সন্ধ্যাবেলা ষ্টেশনে অনিলা যায় সরযূদের সংগে। ইণ্টারক্লাশ কামরায় মেয়েদের ভরা হয়েছে। কি অজস্র কান্না—অনিলা নিজেকে সামলাতে পারে না—প্লাটফর্মে সরে দাঁড়ায়। কর্তৃপক্ষের কে একজন পরিদর্শন করে যান—সকলকে শুভ কামনা জানিয়ে।

ট্রেণ তখনও ছাড়ে নি। একজন মাঝ-বয়সী ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন—অনিলাকে সামনে পেয়ে জিগ্‌গেস করেন, "আপনি অমুক প্রতিষ্ঠানের—"

"হাঁ কি দরকার বলুন?"

ভদ্রলোক গলা খাটো করে নেন, "আর একটি মেয়ে পেয়েছি, কুমারী, বছর সতের আঠার বয়স—এই সংগে পাঠিয়ে দেবেন?"

অনিলা বলে, "এরা এখুনি চলে যাচ্ছে। পরের দলের সংগে যেতে পারে—এত তাড়াতাড়ি কিসের।"

ভদ্রলোক কেমন যেন বিব্রত হন, "আপনি বুঝছেন না—কখন ফস্কে যাবে—"

"সেকি" অনিলা অবাক হয়।

"অনেক ফুসলে বারকরে এনেছি। পেটের জ্বালায় লোভ সামলাতে পারেনি। দেরী করলে আবার কার স্নুনজরে পড়ে যাবে।"

একটু থেমে চারদিক দেখে নিয়ে বলে, "কি সব রাবিস

ভরে পাঠাচ্ছেন—একে দেখলে বুঝতেন—খোদকর্তার কাছে পাঠাবার মত চেহারা— ।”

অনিলার কাছে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়—তবে কি এই মেয়েদের ? চিন্তা করতে পারেনা—গার্ডের হুইসিল—ট্রেণ প্লাটফর্ম ছেড়ে চলে যায়।

“অনিলা তুমিও পাপের ভাগী,” কে যেন চুপি চুপি বলে। সেই রাত্রে গাড়ীতে সে সরযূকে জিগ্‌গেস করে, “এদের কোথায় পাঠানো হ'ল ? কি উদ্দেশ্যে ?”

সরযূ অনেকক্ষণ উত্তর দেয়না—মৃদু হাসে “আপনি লেখাপড়া শিখেছেন এটুকু বুঝতে পারলেন না, মেয়েদের দিয়ে কি ব্যবসা চলে ?”

অনিলার মাথায় আগুন চেপে যায়—অবিরাম সে সরযূকে বকে—শয়তানের প্রতিমূর্ত্তি বলে বর্ণনা করে।

আশ্চর্য্য ! সরযূ এতটুক বিচলিত হয় না, বলে, “আপনি কেন, সকলেই আজ আমাকে ঘেন্না করবে—কিন্তু একবার ভেবে দেখবেন কি, টাকা থাকলে মানুষ যেমন চুরি যাবার ভয় করে—আবার ঐ টাকা দিয়েই নিজেকে সুখী করতে পারে—ঠিক সেই রকম নারীর যৌবন। ভয়ও আছে ভরসাও আছে।” সরযূ কথা বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে, “বিশ্বাস করুন, আমিও আপনাদের মত ভালো মেয়ে ছিলাম। লাঞ্ছনার ভয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসি। কিন্তু এসে কি দেখলাম জানেন—সকলেরই লুব্ধ দৃষ্টি আমার এই শরীরের উপর। যত স্বেচ্ছাসেবক যত

সংঘের পাণ্ডা—সাহায্যদাতা, এমন কি সরকারী কর্মচারী, তারা আমাকে সাহায্য করতে চায়—শুধু আমার যৌবনের দিকে তাকিয়ে। গরীবের আবার সতীত্ব। এখন ভাবলে হাসি পায়—ভিক্ষা করতে গেলেও লোকে পয়সা দেয়—একবার দেহটা দেখে নিয়ে।" দম নেবার জন্য আবার সে থামে, "প্রথম প্রথম পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতাম, কিন্তু যেদিন বুঝলাম এ করলে বাঁচতে পা'রব না—বুড়িমা, অসুস্থ দাদা সবাইকে নিয়ে মরতে হবে। সেদিন থেকে মরিয়া হয়ে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছি। যে আমাকে সরকারী সাহায্য পাইয়ে দেবে বলেছিল, সেই প্রথম আমার দেহ উপভোগ করে, অবশ্য তার ফলে আমি সরকারী সাহায্য পেয়েছি। স্বেচ্ছাসেবিকা হয়ে অনেককেই আনন্দ দিতে হয়। এখন অর্থাভাব কেটে গেছে। আজ দশটি মেয়ে যোগাড় করে দিয়েছিলাম—তিনশ' টাকা কমিশন পেয়েছি। মেয়ে পিছু ত্রিশ টাকা।"

বাড়ীতে নামবার সময় সরযূ বলেছিল "আপনাকে আমি এ লাইনে আসতে জোর ক'রব না, জগৎটা আর একটু দেখে নিন তখন আমার কথাই মানতে হবে।"

অনিলা সব কথা বলে কেঁদে ফেলে, "আর এখানে থাকতে পারছি না। একটা ভদ্দর জায়গায় বাসা ঠিক করে দিন।"

চুপ করে শুনছিলাম—সরলমনা নারীর প্রথম তিক্ত অভিজ্ঞতা। রাত হয়ে এসেছে, গাড়ীর শব্দে অনিলার চমক ভাংগে, "ঐ বোধ হয় সরযূকে পৌছতে গাড়ী এল।"

সত্যিই তাই। গাড়ী থেকে একটি মেয়ে নেমে আসে—অনিলার দিকে চেয়ে ম্লান হেসে বাড়ীতে ঢুকে যায়। অন্ধকারের মধ্যেও গাড়ীটা চিনতে পারলাম। নামজাদা ব্যবসায়ীর গাড়ী—এঁর টাকায় চলছে কত রেফুজি ক্যাম্প, কত অবলাশ্রম। দানের জন্যে সকলেই তাকে ধন্য ধন্য করে।

বাসনাদি কথা শুনে অনিলাকে নিজের দলে ভরে নিয়েছেন, সেও হাসিমুখে যোগ দিয়েছে—এই অবিরাম কাজের স্রোতে। সরকার বিভিন্ন প্রদেশে উদ্বাস্তুদের পাঠিয়ে দিচ্ছে। আন্দামান আসাম, বিহার, উড়িষ্যা সব প্রদেশেই উদ্বাস্তু বাঙ্গালীর মিছিল চলেছে। বাসনাদির সঙ্গে অনিলাও যায় তাদের বিদায় জানাতে। বিদায় বেলা বড় করুণ। বাংলা ছেড়ে যেতে বাঙ্গালীর ভারী কষ্ট।

বললাম, "জগতে আজ বোধহয় এই একমাত্র জাত—যার নিজের বলতে কোন দেশ নেই।"

অনিলা সজল গলায় বলে—"আজ এরা যাযাবর।"

দেখলাম বাসনাদি প্রার্থনা করছেন। হয়তো এই যাযাবরেরা যাতে কোথাও অন্ততঃ এতটুকু মরুদ্যানের দেখা পায় তারই বাসনায়। জানিনা এ আশা সফল হবে কিনা প্রাদেশিকতার মরুভূমির মধ্যে।

যাদবপুরের পাশ দিয়ে গাড়ী করে যাচ্ছি, উদ্বাস্তু সহর গড়ে উঠেছে। দরমার দেওয়াল দেওয়া লাল টালির ঘর—হাজার

হাজার পরিবার। তাদের উপড়ে আনা সংসার, আবার পাতবার চেষ্টা করছে। এখানে হাট বসেছে—দোকান বসেছে—ছেলেদের জন্যে স্কুল হয়েছে—ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পড়তে আসে। স্কুলের মধ্যে নেমে গেলাম। বাসনাদি দরকারি কাজ সারতে আপিস ঘরে চলে যান। আমি আর অনিলা ছেলেদের সঙ্গে গল্প করছি। আশা আকাঙ্খায় ভরা তাদের বুক। "খোকা তুমি বড় হয়ে কি হবে ?" অনিলা প্রশ্ন করে।

ছেলেটি মোটাসোটা, বলে, "বাঙ্গালী হব।"

"বাঙ্গালী ? সে আবার কি ?" আমি অবাক হই !

"তা জানিনা বাবা বলেন বাঙ্গালী মরে গেছে। তোরা সব বাঙ্গালী হবি।"

কেন জানিনা কথাগুলো প্রণের মধ্যে সাড়া দিয়ে গেল ! বালক বোধ হয় ঠিক বলেছে।

হয়তো এরা আবার সতেজ হয়ে উঠবে। আবার ফুল ফোটাবে। ততদিন এদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে যেমন করে হ'ক। অনাগত ভবিষ্যতের নতুন বাঙ্গালী হয়তো ইতিহাসের পাতায় তাদের শ্রেষ্ঠত্বের রায় দিয়ে যাবে।

উপসংহার

সকাল থেকে টিপ্‌টিপ্‌ বৃষ্টি পড়ছে। সেই সংগেই বোধ হয় মনটাও স্যাতস্যেতে—ভালো লাগছেনা। কালকে ডাক্তার বলে গেছে বিশুকে স্যানিটোরিয়ামে না পাঠালেই নয়—ইনজেকসনে আর ফল দিচ্ছে না—মায়াকে কিছু বলতে সাহস হয় না। তবে ভালোর মধ্যে দাদা দেশে গেছেন, ওখানকার সম্পত্তি অদলবদল করার জন্যে। সলিলটার উপর রাগ হয় ছোঁড়াটা কোথায় চলে গেল। ও থাকলে এত ঝক্কি আমাকে পোয়াতে হ'ত না—কোথায় ইনজেকসন কোথায় ওষুধ সব কিছু।

আশ্চর্য্য, ও কোথায় গেল? ইতিমধ্যে বাসনাদি শুধু একটা চিঠি পেয়েছিলেন, ঠিকানাহীন দুলাইন চিঠি, "ভালো আছি আপনাকে ভোলা যায় না। অনেক অনেক প্রণাম।"

পণ্ডিতমশাই বলেন, "এর ভবঘুরের যোগ কয়েক বছর, তারপর হয়তো ফিরবে।"

জিগ্‌গেস করেছিলাম, "কোথায় গেছে বলতে পারেন ?

পণ্ডিত হাসেন, "সেটাতো ঠিকুজিতে থাকে না বাবু, তবে ভালো যায়গাতেই যাবে, সমুদ্র যাত্রার যোগ দেখেছিলাম।"

"তাতা, চোর এসেছে, দেক্‌বে চল," বছর পাঁচেকের আধো আধো কথা বলা ভাইপো আমায় ঠেলা মারছে। অন্যমনস্ক ভাবে জিগ্‌গেস করলাম, "কে এসেছে বাবা ?"

"চোর এসেছে চল না," সে আবদার ধরে।

"চোর এসেছে ? তাই নাকি ? তুমি একটু চোরের সংগে গল্প করো, আমি ততক্ষণ কাজ করি।"

বকাই কান্না স্বরু করে—, "নানা, তা হবে না, এখনই চল বলছি।" কথা ঘোরাবার চেষ্টা করলাম, "চোর কেমন দেখতে বাবু ?"

"দাঁড়িওলা, কালো চোর, বাবার সংগে কথা বলছে। দেকবে চল।"

বকাই আমায় ছা'ড়ল না, নিচে নেমে গেলাম, কথা মিথ্যে নয়, সত্যিই চোর এসেছে।

আগের একটু ইতিহাস আছে, এখানে বলে রাখি। দিন কয়েক আগে রাত্রি বেলা দাদার ঘরে চোর এসেছিল। মাঝরাতে বকাই এর কান্নায় দাদার ঘুম ভাংগে, তখন কাউকে দেখতে পায়নি, সকালে বৌঠানের চেঁচামেচিতে সারা পাড়া জানতে পারে কাল বাড়ীতে চোর এসেছিল, বাথরুমে দেরাজ

ভর্তি মাল উজাড় করে রেখেছে, তবে নেবার কিছু ছিল না, তাই কয়েকটা ঝুটো পুঁতির মালা দামী জিনিষ ভেবে নিয়ে গেছে। এর পরেও বুঝি একদিন চোর মহাপ্রভু পাইপ বেয়ে উঠবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু চাকরের হুমকিতে পালিয়ে যায়।

আজ আবার তারই আগমন, অবশ্য সি, আই, ডি সমভি-ব্যাহারে। নিচে জাঁকালো সভা বসেছে, বাড়ীর বাবু থেকে সুরু করে বৌ ঝি চাকর বাকর কেউ বাদ যায় নি। শুনলাম দাদা বলছেন, "আপনি চুরি করেন কেন?"

ফ্রেঞ্চকাট দাঁড়িওলা শ্যামলা রঙের চোর হেসে পাল্টা প্রশ্ন করে, "কি কর'ব বলুন?"

"আর কিছুই কি করবার নেই?"

তাচ্ছিল্যভরা উত্তর, "চেষ্টা তো কম করিনি। লোকটা আমি খুব খারাপ ছিলাম না, কিছু না করতে পেরে তবেই এই বিজনেস সুরু করেছি।"

"চুরি করলে মন খারাপ করে না?" বৌঠান প্রশ্ন করে। "আজ্ঞে না, এতে বেশ একসাইটমেণ্ট আছে। মনে করুন দেখি অন্ধকার রাত, নিঝুম সহর, বাড়ীগুলো সব ঘুমিয়ে পড়েছে, আপনি রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন। হঠাৎ আপনার মনে হ'ল আজ এই বাড়ীটায় ঢুকে দেখি'। অথচ সে বাড়ীর কাউকে আপনি চেনেন না, কোন ঘরে কজন লোক তাও আপনি জানেন না, পাইপ বেয়ে উপরে উঠে গেলেন, কতরকম ভাবে বাসিন্দাদের দেখতে পাবেন, হয়তো কেউ তাড়া করবে, আপনাকে ছুটে

পালাতে হবে, হয়তো কেউ জানতেও পারবে না। ভাবতে পারেন এতে কতখানি একসাইটমেণ্ট্ ?"

"এ একসাইটমেণ্ট্ তো ভালো নয়" দাদা বিচক্ষণ ভাবে কথা বলেন।

চোর হাসে, "শুধু পেশা নয়, এটা আমার হবিও। সেদিন আপনাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, জানালায় গরাদ নেই দেখে ইচ্ছে হল বাড়ীর ভেতরটা দেখে যাই। আপনার ঘরে ঢুকে চারধার হিসেব করে বালিশের তলা থেকে চাবিটা হাতাবার চেষ্টা করছিলাম। ছেলে কেঁদে উ'ঠল, আপনিও বাথরুমের দিকে গেলেন, আমি তখন খাটের নিচে শুয়ে। আপনারা ঘুমিয়ে পড়লে ড্রয়ার গুলো ঘেঁটে দেখলাম অবশ্য মজুরি পোষাল না।"

সি, আই, ডি ভদ্রলোক এতক্ষণে কথা বলেন, "এটা এঁদের পার্টনারসিপের বিজনেস্। এঁর পার্টনার পাইপ বেয়ে উপরে ওঠার ওস্তাদ। অবশ্য তিনি এখন ফাটকে, আর এনার দক্ষতা গরাদ ভাংগায়। যে কোন গরাদ উনি পাঁচ মিনিটে ভাংগতে পারেন। অবশ্য ফাটকের বাইরে উনিও বেশীদিন থাকতে পারেন না। এই মাস তিন চার ছাড়া পেয়েছিলেন, এখন আবার চললেন।"

দাদা চুরি যাওয়া জিনিষের তালিকা দিয়ে থানায় রিপোর্ট করেছিলেন, বামাল সমেত ধরা পড়ায় সি, আই, ডি তাকে এখানে এনে হাজির করেছে।

চোর চারদিক তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসে,—"আরে জানালায় সব গরাদ লাগিয়েছেন দেখছি, যদি খরচা করে লাগালেনই একটু মজবুত করলেই পারতেন। এসব ভাংগতে আমার দু' মিনিটের বেশী লাগে না। দেখবেন?"

দাদা তাড়াতাড়ি বাধা দেন, "না না, আমি দেখতে চাই না।"

চোর কিন্তু উপদেশ দিয়ে যায়, "খান দু'তিন গরাদ এড়ো দিকে লাগিয়ে রাখবেন। পাইপগুলোয় কাঁটা তার জড়িয়ে রাখা উচিৎ, অবশ্য এহলেও যে আমরা আ'সব না তা নয়, তবে অনেকটা সেফ্।"

হয়তো আরও কথা চ'লত, আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, দাদাকে ধমক দিয়ে উঠলাম, "যার তার সংগে এতক্ষণ কি কথা ব'লছ, Anti Social Element কে এভাবে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।" দেখলাম চোর ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে। সভা ভেংগে গেল। সি, আই, ডি তাকে নিয়ে প্রস্থান করে। আমিও উপরে চলে এলাম।

কেউ শুনে বিশ্বাস করে না। বাসনাদি বলেন, "চোরের সংগে যদি এত কথাই হ'ল, একটু চা, কেক্ খাইয়ে দিলেই পারতে। আতিথেয়তার ক্রটি থা'কত না।"

অনিলা শুধু হেসেছিল, "আপনি যে লেখক, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। কল্পনা শক্তির বাহবা দিতে হয়।"

এক ইংরেজী পড়া শেঠজি উৎসাহিত হয়েছিলেন, "বড় রোমান্টিক চোর তো, একদিন দেখা করতে ইচ্ছে করছে।"

বললাম, "এ আর বেশী কি। ফাটক থেকে বেরুলেই ঠিকানা দিয়ে দেব। রাত্রি বেলা আপনার সংগে দেখা করবে।"

"না না," শেঠজি বিচলিত হন, "ওরকম সময় নয়, এমনি সকাল বেলায় দেখা করতে চাই।"

খবরের কাগজে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলাম, তারা থানায় খবর নেয়। থানা অস্বীকার করেছে, কোন চোর সমেত সি, আই, ডি তারা পাঠায় নি। অতএব সংবাদ আরও ভয়াবহ। কি জানি জাল সি, আই, ডি, কে ? হয়তো বা চোরেরই পার্টনার—যে পাইপ বেয়ে উপরে উঠার ওস্তাদ।

বিশুর ইনজেকসনের ওষুধ পাওয়া যাচ্ছে না সারা কলকাতায়। বাসনাদি অনেকবার মনে করিয়ে দিয়েছেন, আজ তাই হাজির হলাম আমার বন্ধুর দোকানে নামজাদা ব্যবসায়ী। অনেকদিন বাদে দেখে বন্ধুবর পুলকিত, "কি খবর হে, অনেক দিন বাদে—"

"পাঁচ মিশালি কথা হয়। এতদিনের খবর, একসংগে গুছিয়ে বলা, প্রায় ঘণ্টাখানেক বকবক করলাম। বিশু আমাদের দু'জনেরই বন্ধু, তাই তার নাম করে চাওয়াতে ওষুধ পেয়ে গেলাম। বন্ধুবর টেবিলের তলা দিয়ে ওষুধের

প্যাকেট আমার হাতে গুঁজে দেয়, "খুব সাবধান, কেউ টের না পায়। এ ওষুধ এখন বাজারে পাওয়া যায় না।"

"বড় উপকার করলে ভাই," অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। মনে মনে সফলতার গর্ব।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর ইজিচেয়ারে শুয়ে জীবনের দর্শন ভাবছিলাম। কতরকমের সমস্যা উঁকি মারে, কতরকমের জিজ্ঞাসা.........মনে হ'ল ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, কার ঠেলায় ঘুম ভেংগে গেল। তাকালাম।

"আমায় চিনতে পারছেন ?"

চিনতে পারলাম। সেই চোর ভদ্রলোক। জানালার দিকে তাকিয়ে দেখলাম গরাদ ফাঁক করা। বুঝলাম, যা বলেছিল তাই করেছে, গরাদ ফাঁক করতে তার সময় লাগেনি।

"ভয় পাবেন না," চোর ভরসা দেয়, "চুরি করতে আসিনি, আপনার সংগে আলাপ করতে এসেছি।" বসতে বলা উচিত হবে কিনা ভাবছিলাম, সে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল, নিজের থেকেই বলে, "আপনি লেখক জানতাম না। কাগজে পাতার পর পাতা উদ্বাস্তুদের জন্যে কান্নাকাটি করেছেন দেখলাম।"

"কি বলতে চান আপনি ?"

"বিশেষ কিছু নয়," চোর ম্লান হাসে, "সেদিন আমার চুরি করাটা Anti Social বললেন, তাই জিগ্গেস করতে এলাম,

লোকে মদ খায়, বেশ্যাবাড়ী যায়, রেসকোর্সে টাকা উড়ায়, পরস্ত্রীর সংগে প্রেম করে—এ তো সবই anti social. তাদের যদি জেলে না দেন, তবে আমার মত যারা পেটের দায়ে চুরি করে, তাদের anti social বলে জেলে দেবেন কেন ?"

চটে গেলাম। "দেখুন অন্যায় করে সেটা ঢাকতে চেষ্টা করবেন না।"

চোর হা হা করে হাসে, "যাক্‌গে ওকথা, ঐ ওষুধটা কোথায় পেলেন ?"

"আমার এক বন্ধুর দোকান থেকে।"

"জানি, অমুক রাস্তার অমুক দোকান থেকে তো ?"

"কি করে জানলেন ?"

"একমাত্র ঐ দোকানেই এই ওষুধ পাওয়া যায়, আমার মা বহুদিন থেকে অসুখে ভুগছেন। এই ইনজেকসন দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি, অথচ এবার কোন দোকানে খুঁজে পেলাম না। আপনি যে দোকান থেকে এনেছেন, সেখানেও গিয়েছিলাম, তারাও দিলে না।"

বললাম, "হা, সবাইকে এরা দেয় না, জানাশোনা থাকলে—" চোরের মুখে বিদ্রুপের হাসি, "তবেই বুঝুন এরা কত বড় অন্যায় করছে। দরকারী ওষুধ কালোবাজারে দাম চড়িয়ে বিক্রী করে নিজেদের ইমারৎ গড়ে তুলছে। আপনার বন্ধু বলে, আপনার সুবিধা হয় বলে সব বুঝেও এই অন্যায়কে প্রশ্রয় দিচ্ছেন এর চাইতেও anti social আর কি থাকতে পারে ?"

চুপ করে রইলাম। চোর কিন্তু থামে না, "কি উত্তর দিন ? লেখক আপনি, এত বড় দরদী মন আপনার—কৈ এর বিরুদ্ধে একটা কথাও বলতে পারছেন না ?"

রেগে গেলাম, "আপনার সংগে তর্ক করতে আমি চাই না।"

চোর উঠে গিয়ে পায়চারি করে, অনেক্ষণ থেকেই ঝড় বইছিল বোধ হয় বৃষ্টি পড়তে স্বুরু হয়েছে। চোরকে বললাম, "জানালাটা বন্ধ করে দিন।"

চোর হাসে, "কেন ?"

"দেখছেন না, হাওয়া জল সব ঢুকছে, ফার্নিচার নষ্ট হয়ে যাবে যে।"

"ভাবুন দেখি এই ঝড়ে জলে আপনার উদ্বাস্তুর কথা ? মাঠের মধ্যে পড়ে আছে, কি করে বেঁচে থাকবে বলুন তো ?"

মাথায় আগুন চেপে গেল, "সে ভাবনা অপনাকে ভাবতে হবে না। আগে জানালাটা বন্ধ করুন।"

চোর জানালা বন্ধ করে দেয়, "কিন্তু কে ভাববে বলতে পারেন ?"

"যারা ভাববার তারা সবাই ভাবছে। এই তো আমার লেখায়—"

চোর আবার হাসে, "একটা সত্যি কথা বলবেন ?"

"কি বলুন ?" জিগ্‌গেস করলাম।

"উদ্বাস্তুদের জন্যে সত্যি কিছু অনুভব করেন— ?"

কথা শেষ করতে দিলাম না, "তা না করলে আর লিখছি কি করে ?"

"তাইতো জিগ্‌গেস করছি। আমার মনে হয় আজ যারা উদ্বাস্তু নিয়ে এতো মারামারি করছে—তারা কেউই উদ্বাস্তুদের জন্যে ভাবে না। সবাই নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। যে সব কাগজ খুব লেখালেখি করছে তা, তাদের বিক্রী বাড়াবার জন্যে, যে সরকার সাহায্য করার ভাণ করছে তা তাদের মসনদ কায়েমী করার জন্যে, যে নেতারা বক্তৃতা দিয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছেন—সে শুধু পরের গণভোটে সীট পাবার জন্যে—আর আপনার মত যারা উপন্যাস লিখে চোখের জল ফেলছেন—সে নিজেদের নাম লেখক হিসেবে প্রচার করার জন্যে।"

অনুরোধ করলাম, "দয়া করে আপনি বিদায় হবেন কি? আর বাজে বক্‌তে পারছি না।"

চোর মিটি মিটি তাকায়, "সত্যি কথাগুলো, শুনতে বড় বিশ্রী লাগে, না?"

না এ অসহ্য। বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করে, যা তা বলে যাবে অথচ কিছু বলতে পা'রব না। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম—কৈ কেউ তো নেই। চোর মহাপ্রভু উপে গেলেন কোথায়? জানলার দিকে তাকালাম। আগের মতই গরাদ লাগানো কেউ ফাঁক করেনি। তবে কি এতক্ষন স্বপ্ন দেখছিলাম। নাতো দিব্যি জেগে আছি। তবে চোর কে? চিনতে পারলাম—বঙ্কিমচন্দ্র পড়া আমার মন—বনফুলকে ভালবাসা আমার মন—বিবেকের সঙ্গে তর্ক করছিল। বিবেকের একি অত্যাচার? রাতদুপুরে ছুঁচ্ ফোটাচ্ছে কেন?

জিজ্ঞাসা

ঘুমুতে পারলাম না। সকলের জিগ্‌গাসার উত্তর দেওয়া যায়, কিন্তু বিবেকের জিগ্‌গাসা, কি উত্তর দেবো? সত্যিই কি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্যে আমার লেখা?

আজ যে উদ্বাস্তুদের নিয়ে এত হৈ হৈ সবই কি লোক দেখানো—সবাই কি নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কুমীরের কান্না কাঁদছে?

জিগ্‌গাসার মিছিল চলেছে চোখের সামনে দিয়ে—কোন উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না।

STATE CENTRAL LIBRARY
Calcutta